এখন ডুয়ার্স

১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৬। ১২ টাকা

ক্যাশলেস ডুয়ার্স পরিক্রমা

তিস্তা বঙ্গের মেলা-উৎসব ৩য় পর্ব

সমবায় ভিত্তিতে চা-বাগান চালানোর পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত আদৌ কি ফলদায়ক?

ডুয়ার্সের বড়দিন

ডুয়ার্সের পর্যটনে নদী সৌন্দর্য

এবারের সংখ্যার সঙ্গে **ফ্রি ক্যালেন্ডার** নিতে ভুলবেন না

মিস ইন্ডিয়া হওয়ার দৌড়ে ডুয়ার্স কন্যা কৃতি শর্মা

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

তৃতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (অন্তবর্তী সংস্করণ) ১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স

নিজেরা কি বদলাতে পারব আদৌ? ৩

ক্যাশলেস ডুয়ার্স

সবুরে ফলবে, না পচে যাবে ডুয়ার্সের মেওয়া? ৭

দিব্যচোখে

আমরা কি অবশেষে সত্যযুগে প্রবেশ করিতেছি? ১১

দেবদেবীর পুজো ঘিরে মেলা ও উৎসব ছিল বন্যজন্তু আর মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই ১৩

সমবায়ের ভিত্তিতে বাগান চালানোর সিদ্ধান্ত কি আদৌ ফলদায়ক? ২৭

ডুয়ার্সের ডায়েরি

ডুয়ার্সে বড়দিন নিজেকে নম্র করার দিন ৩৬

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

এক যে ছিল ঘাসঅলা ৩৮

বংশ শিল্পকথা ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৫

পর্যটনের ডুয়ার্স ২৪

বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪১

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩২

তরাই উৎরাই ৩৪

লাল চন্দন নীল ছবি ৪২

শ্রীমতী ডুয়ার্স

এবারের শ্রীমতী ৪৬

ভাবনা বাগান ৪৭

মিস ইন্ডিয়া হওয়ার দৌড়ে ডুয়ার্স কন্যা কৃতি শর্মা

কৃতি শর্মা নামটা কে দিয়েছিল এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে কৃতি-কে অভিনন্দন! বীরপাড়ার মেয়ে কৃতি শর্মা ১০ নভেম্বর নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'মিস ইন্ডিয়া এক্সকিউজিট ২০১৬' প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের মেয়ের এই সাফল্য আশা দেখাচ্ছে ভবিষ্যতে তিনি 'মিস ইন্ডিয়া' খেতাবেরও অধিকারী হতে পারেন। এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'ওম্যানহুড' উদ্‌যাপন করা হয়। 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার আগামী সংখ্যায় কৃতি শর্মাকে নিয়ে 'শ্রীমতী ডুয়ার্স' বিভাগে থাকছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

'এখন ডুয়ার্স' পুরনো সংখ্যা

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার জন্য হামেশাই আমাদের কাছে ফোন বা মেল আসে। ম্যাগাজিন স্টলে বা হকারদের কাছে কোনও পত্রিকারই পুরনো সংখ্যা পাওয়া যায় না। আমাদের পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলি অবিক্রীত কিছু কপি সযত্নে রাখা থাকে। সারা বছরের প্রকাশিত সবকটি সংখ্যা এক সঙ্গে নামমাত্র দামে আসন্ন বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স' স্টল থেকে বিক্রি করা হবে।
বাইরেও কেউ চাইলে ক্যুরিয়ার যোগে পাঠান যেতে পারে।
যোগাযোগ **দেবজ্যোতি কর, ৯৮৩০৪১০৮০৮**।

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা

গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার

টিভিতে ম্যাচ দেখা

বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা

এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

facebook.com/aaddaghar

সম্পাদকের ডুয়ার্স

নিজেরা কি বদলাতে পারব আদৌ ?

আরেকটা বছর পেরিয়ে আবার দেওয়ালের ক্যালেন্ডার বদলাবার সময় হয়ে গেল। কিন্তু আমরা নিজেরা বেশ ভাল করেই জানি, আমরা নিজেদেরকে অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি। বছরের গোড়ার দিকে বাংলার মসনদ থেকে পাঁচ বছরের পুরনো ক্ষমতাসীনকে বদলানোর ডাকে আমরা কেউ কেউ সাড়াও দিয়েছিলাম। ‘পরিবর্তনের পরিবর্তন’— মিডিয়ার স্লোগান ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শহরাঞ্চল কিছুটা সাড়া দিলেও ভরতুকির পুষ্পবর্ষণে মোহিত গ্রামবাংলা মুখ ফিরিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করল। আমাদের বদলানো হল না, গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে বৃহত্তর জনতার রায় মাথা পেতে নিতে হল।

বছরের শেষ ভাগে এসে প্রধানমন্ত্রীর ‘ভ্রষ্টাচার দূরীকরণ’-এর ডাকে আপাত নাজেহাল মানুষ মনের কোণে ফের পুষতে শুরু করে দিয়েছে বদলানোর কামনা। যেখানে পুঞ্জীভূত কালা ধনের মায়া ত্যাগ করে হাজার হাজার ধনবানকে রাস্তায় নামতে হবে, যেখানে টাকার বদলে কার্ড সোয়াইপ বা বুড়ো আঙুলের ছাপে কেনা যাবে চাল-সবজি-মাছ-মাংস-তেল-নুন ও বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদ ও পরিষেবা। বদলানোর আশায় বুক বাঁধছে, যাদের হাতে ক্যাশ থাকে না, তারাও। কিন্তু সন্দেহ জাগছে মনে, আমরা কি নিজেরা বদলাতে পারব আদৌ? এত দিনের পুরনো অভ্যাস, পুরনো ধ্যানধারণা, পুরনো মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে থাকার ইচ্ছা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারব? ‘চলো পালটাই’ অতি প্রিয় শব্দবন্ধ হলেও আদপে তা যে দেওয়ালেই থেকে যায়, পালটানোর রীতিতে আমরা কখনওই যে আরাম বোধ করি না, আমরা সমগ্র জাতিই সেই প্রমাণ বারবার দুনিয়ার সামনে দিয়েছি।

পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে ‘এখন ডুয়ার্স’ একটা বছর পূর্ণ করল। পত্রিকার কলেবরের সঙ্গেই তার জনপ্রিয়তা বেড়েছে— এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু গত একটা বছর ধরে পনেরো দিন পরপর ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, গত কয়েক দশকে আমাদের বঙ্গভূমির এই প্রান্ত বস্তুত এতটুকুও এগয়নি, সেই একই জায়গায় থেকে গিয়েছে। ডুয়ার্সের মাটি- জলবায়ুতে আলস্যের বীজ থাকে— এ কথা কারওই অজানা নয়। পর্যটনের জানালা দিয়ে এখন যৎকিঞ্চিৎ হলেও বাইরের আলো এসে পড়ছে, সোশাল মিডিয়ার সংক্রমণ প্রতিটি কোণে কোণে, বাইরের দুনিয়ার কাছে আজ আর ‘অজানা গন্তব্য’ নয় ডুয়ার্স। তবু নদী-পাহাড়-জঙ্গল-চা-বাগান ঘেরা এই মায়াবী ভূখণ্ড বাইরের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে, আজও সেই ফ্রেমে বাঁধা স্থবির ক্যানভাস।

একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ ও পাঠকের কাছে পৌঁছাতে গেলে যেমন প্রয়োজন অর্থ, তেমনই প্রয়োজন লেখকের। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত এক বছরে সেই লেখকের অভাবই সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি আমরা। অথচ রুগ্‌ণ চা শিল্প, নারী পাচার, শিশু পাচার, অস্ত্র পাচার, চোরাশিকার, জঙ্গিদের অবাধ বিচরণ ইত্যাদি শত সমস্যায় দীর্ণ ডুয়ার্সে লেখার বিষয়ের অভাব নেই। রাজনীতি এখন জোচ্চোরদের পাল্লায়। সাধারণ মানুষের আজ হয়ত রাজনৈতিক উত্থান-পতনে খুব একটা হেলদোল নেই। কিন্তু অজস্র বিষয় আছে, যেগুলি বাইরের পৃথিবীকে না জানালে চির-অবহেলিত থেকে যেতে হবে আমাদের। অথচ ডুয়ার্স জুড়ে শত-হাজার কবি-গল্পকারের অভাব নেই। তাঁরা সব দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের ছোট ছোট বৃত্ত গড়ে ছোট ছোট বইপত্র ছেপে একে-ওকে বিলি করে নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন। কিংবা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সভায় সেজেগুজে যাচ্ছেন, কতক্ষণে সেসব ছবি সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করবেন, সেই ভরসাতেই। এঁরা পাঠক-শ্রোতা বাড়াতে পারেন না, কারণ এঁরা বিশ্বাসই করেন না যুগের পরিবর্তনে। সাহিত্য, গল্প বা কবিতার মাধ্যমে যে মানুষের কাছে আজ পৌঁছানো যাচ্ছে না— এ সত্য মানতে চান না তাঁরা। কলমই যদি বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা বলে ভাবেন তাহলে মানুষের চেতনাকে ছুঁতে গেলে যুগের চাহিদা মেনে ফর্ম্যাট পালটাতেই হবে। কারণ আমাদের কথা বাইরের ওদেরকে না জানালে আমাদের ব্যথা-ভাবনা সবার অজানাই থেকে যাবে। বছরের পর বছর পাতার পর পাতা লেখা বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু নিজেদের আশপাশের সংকটে কলম হাতে দাঁড়ানোটা বোধহয় বেশি জরুরি।

আজকের ডুয়ার্সে চা শ্রমিক যেমন ঘরের মেয়েটিকে বিক্রি করে দিচ্ছে, কৃষক বাড়ির উঠতি বয়সের ছেলেটি যেমন কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে, তেমনই একজন আদর্শ শিক্ষক তাঁর পুত্র-কন্যাটিকে দূরের কোনও স্কুল বা কলেজে ভরতি করে দিয়ে ফিরে এসে অজানা আশঙ্কায় অনিদ্রায় ভুগছেন। ‘এখন ডুয়ার্স’ প্রকাশ শুরু হয়েছিল সেই ব্যথাভরা ডুয়ার্সের ছবি ঘরে-বাইরে সবাইকে পৌঁছে দিতে। পাঠক কিন্তু প্রস্তুত, সেই সংখ্যায় ভাটা পড়েনি আজও। প্রয়োজন শুধু লেখকের নিজেকে বদলানোর।

আন্দামান

গোয়া

কেরালা

যে কোনও দিন

ANDAMANS
Ex Port Blair. 6N 7D
Portblair Sightseeing, Cellular Jail, North Bay-Ross Island/Jolly Buoy, Havelock/ Neil island, Jarwa Reserve. Rs 16,500 Standard. CP, Non AC Vehicle & Govt Boat. Additional charges for Mayabandar-Diglipur.

GOA
Ex Dabolim Airport / Madgaon Rly. Stn. 3N 4D. Rs. 13,900 Standard. Plan CP, Pick up & drop Station/Airport, tea coffee maker, one full day sightseeing trip with river Mandovi cruise, Unlimited Swimming Pool. (Except Dec. 15 to Jan. 5)

KERALA
Ex Cochin. 7N 8D
Cochin-Munnar-Thekkady-Alleppey/Kumarakom-Kovalam Rs 26,000 for Deluxe. Plan CP; AC vehicle for transfer & sightseeing.

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

ক্যালেন্ডার ২০১৭। ডুয়ার্সের মুখ

বছরের নানা ঋতুতে বদলায় ডুয়ার্সের রূপ ও রং। তার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তন ঘটে ডুয়ার্সের মানুষের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের। এখানে নতুন বছরের সূচনা ঘটে ধামসা মাদলের তালে। তারপর বছর এগিয়ে চলে কখনও শৈশবের উচ্ছ্বলতায়, কখনও বা চা-বাগানের তরুণীর কর্মব্যস্ততায়, কখনও বা লাজুক রমণীর হাসিতে। বছরের শেষ লগ্নে পৌঁছে বলিরেখার অজস্র ভাঁজে কি ফুটে ওঠে কোনও অনিশ্চয়তার সংকেত? আর এইসব ছবিতেই বছরভর সেজে ওঠে ডুয়ার্স। অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পী গৌতমেন্দু রায়ের লেন্সে ধরা পড়েছে সেই সব অনবদ্য ছবি। পেশাগত কারণে এখন কলকাতার বাসিন্দা হলেও উত্তরে তাঁর যাতায়াত নিয়মিত। সুযোগ পেলেই ডুয়ার্সের আনাচকানাচে ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়েন। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাঠকদের এবার উপহার দিলেন বাছাই করা ক'টি ছবি। সেই সঙ্গে সবার জন্য নতুন বছরের শুভকামনা।

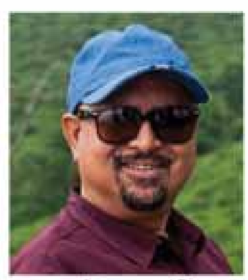

এখন ডুয়ার্স

পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন | জঙ্গল | জনসত্তা | শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

প্রত্যেক মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়

Contact us: Mukta Bhavan, 1st Floor, Merchant Road, Jalpaiguri - 735101
Call us: 03561-222117 Mail us: ekhonduars@yahoo.com

খুচরো ডুয়ার্স

ক্যাটাসট্রফি

খুব টেনশন গেল ক'দিন হেলাপাকড়ি গ্রামে। প্রথমে জোর খবর রটল যে, একটা চিতা বাঘ নাকি চুপচাপ রোদ পোহাচ্ছিল। তারপর দেখা গেল, ওই যে গাছে হলুদ-কালো ডোরাকাটা, ওটা কী? শুরু হল তুমুল বিতণ্ডা, ঢিল ছোড়াছুড়ি, গুঁতো ইত্যাদি। বেচারা জানোয়ারের মুখ ফুলে গেল ঢিল খেয়ে, গায়ে লাগল চোট। তবুও ব্যাটা ধরা পড়ল নাকো! কিন্তু ব্যাটা কি চিতা না অন্য কিছু? কেমন ছোট ছোট ঠেকছিল না? চিতার বাচ্চা নাকি? তা হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায়? আবার টেনশন! তারপর জানা গেল, সেটা লেপার্ড বটে, তবে

কিনা আসলে বেড়াল। মানে লেপার্ড ক্যাট। হেলাপাকড়ি এসে মোটেই গোলমাল করার ইচ্ছে নেই এই বেড়ালের। সদ্য শীত পড়ায় একটা উঁচু জায়গা দেখে গা সেঁকছিল। লোকে এমন খাবি খাবে তা মোটেই ভাবেনি সে। তা শেষমেশ চিতা বেড়াল অবশ্যি গ্রেপ্তার হয়েছে। সেবাশুশ্রূষা করে ফের তাকে অরণ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। যাক! লোকে যা অত্যাচার করেছে, যেন বেচারা কালো টাকা গুনছিল।

অনন্ত চাপ

ভারী আতান্তরে পড়ে গিয়েছেন গ্রেটার কোচবিহারের অনন্তবাবু। সরকারের টাকাপয়সা খোঁজার লোকজন তাঁকে খুব চাপে ফেলে দিয়েছে যে! তাঁরা খুঁজে পেয়েছে যে অনন্তবাবুর ব্যাঙ্কের খাতায় অনন্ত টাকা! আড়াই কোটি! কী বিরাট একখানা বাড়ি। সেই আলিশান ভবন দেখে আয়কর আদায়কারীরা হায় হায় করে উঠেছেন! কোচবিহারের চকচকায় চকচকে প্রাসাদ করে ঢাই ক্রোড় রুপেয়া আয়া ক্যায়সে? জঙ্গিরা চাঁদা দেয়নি তো? আড়াই কোটির খাতা 'ফিরিজ' করে দিয়ে কর্তাব্যক্তিরা এখন তুমুল জিজ্ঞাসাবাদ করছেন অনন্ত রায়কে। রায়বাবু অবশ্যি টসকাচ্ছেন না। বরং বলছেন যে, আমার সম্পত্তি আমি কাউকে বলব নাকো। যা খুশি করে করুক!

সুবোধ বিমল

হায়! বিমলের হল কী? এই সে দিন তিনি লোকজন ডেকে বলেছেন, না হে! এখন পৃথক রাজ্যের জন্য আন্দোলন করা ঠিক হবে না। শোনার পর সবাই বেশ অবাক। বিমল সাধুসন্নেসি হয়ে যাবেন না তো? কিন্তু রাজ্যের দাবি সরিয়ে রেখে 'মুভমেন্ট' হবে কী দিয়ে? বিমল বলেছেন, চলো! দিদির বিরুদ্ধে, থুড়ি, দিদির ভাইদের কালো টাকার বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে এভারেস্টে ধস নামাই। তাই আপাতত গজমম-র ভাই-বেরাদররা ঘাসফুলের কালো টাকা খুঁজতে উঠে-পড়ে লেগেছে। তাহলে কি ক'দিন আগে দিল্লি গিয়ে পদ্ম ফুলের মধু খেয়ে আসেননি বিমলজি? কে জানে! তবে ঘাসফুল অবশ্যি এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। মানে, বিমলকে নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না তারা।

যাচ্চলে

হলদিবাড়িতে ফি-বছর টম্যাটো, লংকা ইত্যাদির জোর চাষ হয়। সবজি উৎপাদনে ডুয়ার্সে বেজায় নাম তার। ছোট্ট এই শহরে বেশ একটা ব্যবসা ব্যবসা পরিবেশ আছে। তাই সরকার ভাবল, তা-ই তো! ব্যবসায় এত যখন মতি, তখন হলদিবাড়িতে জলদি একটা বাণিজ্য কলেজ বানাতে হচ্ছে। অমনি তড়িঘড়ি করে হলদিবাড়ি কলেজে কমার্স পড়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছিল আগের গর্মেন্ট। তারপর এক যুগ কেটে গিয়েছে। এখন নিশ্চয়ই উপচে পড়ছে কলেজের কমার্স বিভাগ? সিট পাওয়ার জন্য হাহাকার করছে ছেলেমেয়েরা? আজ্ঞে না কর্তা! সে বিভাগ বেবাক ফাঁকা। কেউ পড়তে আসছে নাকো। স্কুল সার্ভিসে কমার্সের সিট নেই কিনা! রসিকজনদের মতে, বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও স্টুডেন্ট মিলবে না। নাকে চশমা, কানে হেডফোন গুঁজে মোটা মোটা কেতাব পড়ে কি কেউ ব্যবসা করে নাকি? চাকরি না পেলে ব্যবসা পড়বে কেন হে? তা-ই তো!

হাঁসফাঁস রাস

বেচারা রাসমেলার ভাগ্যটাই এবার খারাপ। একেই তো উপনির্বাচনের ঠেলায় পিছিয়ে গিয়েছিল সে। সেটা না হয় মেনে নেওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেই যে নোট বাতিলের গুঁতো! কেনাকাটার ব্যাপারে

খদ্দেরদের ভারী আলসেমি। ফি-বছর প্রায় ডজনখানেক বাংলাদেশি স্টল এসে ইলিশটা, দইটা, শাড়িটা বেচে যায়। এবার এসেছে মোটে এক গন্ডা। ওদিকে আবার মেলায় আসা 'জয় রাইড'গুলোর একটা দুর্ঘটনায় পড়ে বিস্তর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। শীত এসে গিয়েছে। এখনই তো ডুয়ার্সে মেলা, যাত্রা, পালাটিয়া আর কীর্তনের মরশুম। কিন্তু রাসমেলার মতো হেভিওয়েট উৎসবের হাল দেখে উদ্যোক্তারা খুব টেনশনে। কী যে হবে! অমন যে জিবে জল আনা ভেটাগুড়ির জিলিপি, তারও খদ্দের জুটছে না গো! দেশের কী হল রে বাপ!

আবার

বালুরঘাট স্টেশনের মাস্টারমশাই কয়েক মাস আগে বেশ তরল অবস্থায় ডিউটি করতে গিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন। তারপর ভেবেছিলাম যে, আহা বেচারা! ডিউটির চাপে না হয় একদিন দু'পাত্তর পান করে ফেলেছিলেন। উচ্চমহলের ধমক খেয়ে নির্ঘাত ভাল হয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু সে গুড়ে বালি। এই সে দিন তিনি কাউন্টার থেকে যাত্রীদের টিকিট দিচ্ছিলেন। তবে আর পাঁচ দিনের মতো সে দিন টিকিট দেওয়ায় কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। মাস্টারমশাই দাম নিচ্ছিলেন ইচ্ছেমতো। কখনও কম তো কখনও বেশি। সঙ্গে সঙ্গে

প্রতিবাদ। আন্দোলন। ঘেরাও। রেল পুলিশ ছুটে এসেও সামলাতে ব্যর্থ। শেষে সব যাত্রীকে বিনে পয়সায় ট্রেনে উঠতে দিয়ে

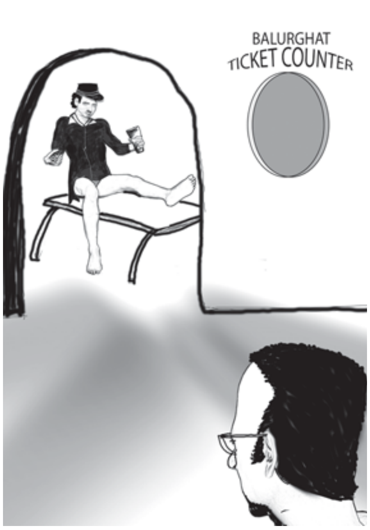

কোনওরকমে মুখরক্ষা। গুজবে প্রকাশ, তিনি নাকি ক'দিন আগে বালুরঘাটে বুলেট ট্রেনের স্টপেজ দেওয়ার দাবি জানিয়ে দিল্লিতে চিঠি লিখবেন বলেছিলেন। লেখেননি তো?

পুনর্বালুরঘাট

কলেজে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় একজন পেয়েছে ৬৫ তো আরেকজনের জুটেছে ৭০। যারা পেয়েছে, তারা সবাই হাঁ। কেন কেন? সন্তুষ্ট হয়নি বুঝি? খাতা দেখা নিয়ে নির্ঘাত অসন্তুষ্ট হয়েছে তারা? না রে কাকা! এখানে গল্প আলাদা। যে পরীক্ষায় এই নম্বর, সে পরীক্ষায় যে পূর্ণমান ছিল ৬০! পরীক্ষাটা ছিল পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক। এমনিতেই সে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল মার্চে। হয়েছে জুনে। কিন্তু পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে যে একশোতে দেড়শো পাওয়া যায় তা কেউ ভেবেছিল গো! ফলে মার্কশিট হাতে পেয়ে ছেলেপুলের ভিরমি খাওয়ার জো! তবে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নাকি এইসব অভিযোগ শুনে ভারী উদাসীনভাবে জানিয়েছে, রেজাল্ট? রেজাল্ট তো বারই হয়নি। কয়েকটা বাতিল করা মার্কশিট বেরিয়ে গিয়েছে জানি কী করে! বোঝো!

দেখা যাক

কোচবিহারের নয়া সাংসদ পার্থপ্রতিমবাবু নাকি শিক্ষকতা মোটেই ছেড়ে দিচ্ছেন না। সংসদের কাজকর্ম সেরে তিনি মাঝে মাঝেই নিজের স্কুলে ইংরেজি পড়াবেন আগের মতোই। ক'দিন আগেই সেটা করেও দেখিয়েছেন। তা ভাল ভাল! চালিয়ে যেতে পারলে ব্যাপারটা অভিনব হবে সন্দেহ নেই। তবে নিন্দুকরা বলেছে যে সংসদ না হয় হল, এর পরে যে দল বলে একটা ব্যাপার আছে, সে খেয়াল আছে? দলে যে একটা দিদি আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে? তাই বছরে দু'-চার দিনের বেশি ক্লাস নিতে পারলে হয়। আবার ওদিকেও চাপ কম নেই গো! আগে স্কুলে এলে স্কুল বলত, যাও পার্থ, ক্লাসে যাও। এখন এলে বলছে, হে পার্থ! স্কুল সীমানায় প্রাচীর নাই, খেলার মাঠ উত্তম নাই, অমুক নাই, তমুক নাই ইত্যাদি। তা দেখাই যাক! ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় কি না!

ডেঙ্গুজি ডেঙ্গুজি

শিলিগুড়িতে এসে ডেঙ্গুজির ভারী মজা। তাঁর অনুগত মশকবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য ব্লিচিং ছড়ানো নিয়ে জোর গোলমাল বেধেছে 'গৌতমাশোকে'। গৌতম বলছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরকে ব্লিচিং ঢালতে দিচ্ছেন না অশোক। অশোক বলছেন, ওই দপ্তরের এক্তিয়ারই নেই ব্লিচিং ছড়ানোয়। মেয়র বলছেন, মন্ত্রী নিজের চরকায় তেল দিক। মন্ত্রী বলছেন, মেয়র ইউনাইটেড নেশনে অভিযোগ জানান। তালেগোলে ব্লিচিং এখন গৌণ। ফলে মশকদের আহ্লাদের সীমা নেই। গৌতম না অশোক, কে ধরিবে মশক— এই প্রশ্নের নাকি আশু সমাধানের সম্ভাবনাই নেই। এদিকে শিলিগুড়িতে শ'দেড়েক লোককে মশকরা খাবি খাইয়েছে। একজন মারাও গিয়েছে। একটাই আশা, যদি শীত পড়লে মশকরা একটু লেপ মুড়ি দিয়ে কয়েক মাস ঘুমিয়ে কাটায়।

হুল হুল

রাজগঞ্জের টাকিমারি বাজারের কাছাকাছি ওদের বাহিনী ওত পেতে থাকে। বাজার বসলেই 'আক্রমণ'। ক্রেতা-বিক্রেতা মুক্তকচ্ছ হয়ে পলায়ন। পুলিশ প্রশাসন জব্দ। হুঁ হুঁ বাবা! যে-সে বাহিনী নয় গো! একেবারে মৌমাছি স্কোয়াড। বাজার বসলেই ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবল বোঁ বোঁ রবে হামলা চালাচ্ছে হাটুরেদের উপর। এমনিতে ফি-বছর মক্ষিকাগণ বাজারের হেথা-হোথা ডজন দুয়েক বাসা বানিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করলেও এবার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আছে। অবশ্যি দোষটা মনুষ্যের নয়। দিনকয়েক আগে একটা পাজি পাখি উড়ে এসে একটা চাক ঠুকরে ভেঙে দিয়েছিল। সেই থেকেই রাগ! হামলার পাশাপাশি মুড়ি-মুড়কি-মিঠাইয়ের দোকানেও নজর পড়েছে তাদের। বন দপ্তর অবশ্য বলছে যে ওদের ধরার মতো কিস্‌সু নেই তাদের হাতে। বাজার বসাতে চাইলে ধুনো দিয়ে তাড়াক ওদের। কিন্তু চাকের গোড়ায় ধূম্র দেবে কে? ফলে টাকিমারির বাজার এখন নোটের অভাবে নয়, মৌমাছির প্রাচুর্যে লাটে উঠতে চলেছে।

টুকরো খবর

ম্যাক-এর এগজামে এ-গ্রেড পেল এনবিইউ। জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লিগ কি এবার বোল্ড আউট? ডুয়ার্সে শিশু পাচারের হদিশ পেয়ে প্রশাসন আদা-জল খেয়ে নেমে পড়েছে। চিতার উপর সাইকেল ছুড়ে হামলা থেকে বাঁচলেন মালবাজারের গ্যারাজ কর্মী। পুরপ্রধানের পদ ছাড়ার আগে অস্থায়ীদের স্থায়ী এবং জলকর বিলোপ করে দিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু। কোচবিহারে হরিতাল পাখিদের নিউমোনিয়া এবং পরলোকগমন। মুর্শিদাবাদের নবাবের উত্তরসূরির সম্পদের পরিমাণ ১,৮০০ কোটি হলেও তাঁর ডাল-ভাত জুটছে না। তিন দিনে ডজনখানেক বাড়ি ভেঙে দুষ্টুমি হাতিদের। মিহিরকিরণে এনবিএসটিসি-র আশ্চর্য রোজগার।

আনইউনিফর্ম

ভারী জটিল ব্যাপার ঘটেছে রায়গঞ্জের এক স্কুলে। এদ্দিন সে স্কুলে ইউনিফর্ম ছিল লাল। কিন্তু সে লাল নাকি আর থাকছে না। তার বদলে আসছে আকাশি। এতে বেজায় চটেছে অভিভাবক আর লোকজন। লাল পার্টির সেই দিন নেই ঠিকই, কিন্তু লাল মানেই কি পার্টি? লাল চা কি ডানপন্থীরা খায় না? লাল সূর্য

দেখলে কি শুধু কমরেডরাই খুশি হয়? তাহলে খামকা স্কুলের ঐতিহ্যে কুড়ুল মেরে আকাশি আনার কী মানে? তা ছাড়া খুকিদের লাল হলেও খোকাদের প্যান্টুলের কালার তো কালো! সে তো কোনও পার্টি কালার নয় রে বাপ! তদুপরি রং বদলে যার নামে স্কুল, সেই সারদার অপমান হচ্ছে। তবে? বলছ সাদার সঙ্গে আকাশি আসলে নীল-সাদা! তবে? সব মিলিয়ে বেশ জটিল পরিস্থিতি।

ক্যাশলেস ডুয়ার্স পরিক্রমা ১

সবুরে ফলবে, না পচে যাবে ডুয়ার্সের মেওয়া ?

‘পরের মাসে আপনাদের বেতন তো কমবে না, কিন্তু আমাদের কী হবে ?’

নোট বাতিলের তিন সপ্তাহের মাথায় উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন মৌলালি হাটের সবজি বিক্রেতা। কিঞ্চিৎ বাজার করে দাম মেটাবার সময় ক্রেতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে বিক্রিবাট্টা চলছে কেমন ? হাটে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। পাইকাররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চেষ্টা করছেন নগদ জোগানের কোনও রাস্তা বার হয় কি না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন গভর্নরের সই করা দু'হাজার টাকার নোট ভাঙালে বাট্টা কত দিতে হবে, তা নিয়ে মৃদু গলায় দরদাম হচ্ছে। ফসল কাটার লোকের খোঁজে আসা কৃষক বিড়ি টানতে টানতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মচারীকে থামিয়ে জেনে নিচ্ছেন যে পরদিন ‘সিলিপ’-এ কত টাকা তোলা যাবে।

ডুয়ার্সে পর্যটন শিল্প কয়েক বছর হল নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এ বছর পুজোর পর্যটন জোর ধাক্কা খেয়েছিল বৃষ্টির কারণে। কিন্তু শীতের পর্যটনে দেখা যাচ্ছিল স্বাস্থ্যকর হাওয়ার সম্ভাবনা। আগাম বুকিং সেরে রেখেছিলেন বহু মানুষ। প্রকৃতি তার হেমন্ত ঋতুর বিষণ্ণতা অতিক্রম করে শীতের দিকে এগিয়ে গেলেও আপাতত ডুয়ার্সের শীত পর্যটন তীব্র অনিশ্চয়তার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে। চা শিল্পের বাইরে ডুয়ার্সে তেমন কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। ছোট এবং মাঝারি মাপের গুটিকয় কারখানা ছাড়া এই অঞ্চলের অর্থনীতি আসলে চাষনির্ভর। বহু হাটের বাণিজ্য নির্ভর করে থাকে চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরির উপরে। এই বাইরে কালো অর্থনীতিও আছে। সীমান্তের চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার, চোরাশিকার ইত্যাদি চলে। নোট বাতিলের ‘ঐতিহাসিক’ ধাক্কায় সকলেই বিভ্রান্ত। ক্ষতিগ্রস্ত তো বটেই।

‘জাল টাকা দিয়ে পাচারের কাজ হয় না। ওটা দেশের অর্থনীতিতে আঘাত করার জন্য ছড়ানো হয়।’ ব্যাখ্যা করছিলেন পুলিশের জনৈক এসআই। জাল টাকার কারবারিরা যে মোদিজির ঘোষণায় রাতারাতি বেকার হয়ে গিয়েছে, সে নিয়ে বক্তার মনে কোনও সন্দেহ নেই। নতুন নোট জাল হতে শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই বেকারত্বের অবসান ঘটবে না। হাতে থাকা পুরনো নোট অকেজো হওয়ার কারণে ডুয়ার্সের অপরাধচক্র থমকে থাকবে কিছুদিন। আয়কর বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী সমর বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ‘সিস্টেম কি বদলে গিয়েছে

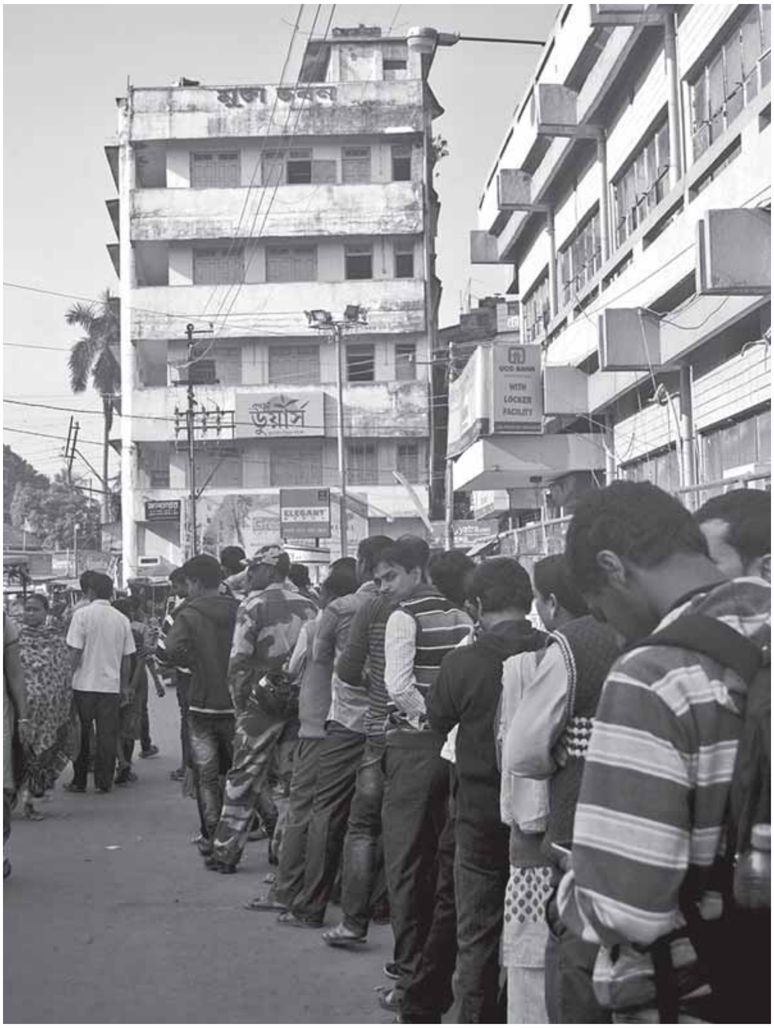

নোটের পরে নোট জমেছে
আর জমেছে কালো
সাধারণের ধন্দ মনে
মন্দ? নাকি ভালো?
ঘাম ছুটেছে ব্যাঙ্কদাদাদের
দেদার গালাগালি
এটিএমের লাইন যেন
আর হবে না খালি!
চকমকানো দুই হাজারি
ভাঙতি কোথায় মেলে?
কার টাকা যে কোনখানে যায়
কে যাবে কোন্ জেলে!
ডিজিটালের হাতছানি আজ
সঠিক? নাকি ভুল?
কমোন মানুষ ধৈর্য্যহারা
খামচে তোলে চুল!

অমিত কুমার দে

ভাই? বাজারে নতুন নোট এলেই তার একটা অংশ কালো হতে শুরু করবে।'

নোট বাতিলের আটাশ দিন পরেও চুখানি হাটের পাইকাররা শাক কিনতে পারলেন না। ওই হাট শাকের জন্যই বিখ্যাত। পাইকারদের একটি মিনি ব্যাঙ্ক আছে, যার খাতা সামলায় সমবায় ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যাঙ্ক নগদ জোগানে আবার ব্যর্থ। ডুয়ার্সের গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাঙ্ক বলতে মূলত উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ককেই বোঝায়। কেন্দ্রীয় সরকারের লোকজন যখন বলছেন যে, ব্যাঙ্ক থেকে উইদড্রয়াল স্লিপ দিয়ে হপ্তায় দশ থেকে চোদ্দো হাজার টাকা তোলা যাবে, তখন গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি 'সিলিপ'-এ দিতে পারছে পাঁচশো থেকে এক হাজার। 'আমার কাছে আট হাজার টাকার পুরনো পাঁচশো আছে।' বললেন এক পাইকার, 'এটা ব্যাঙ্কে জমা দিলে আটকে থাকবে। তাই পুরনো নোট দিয়েই ব্যবসার চেষ্টা করছি। একজন বলেছে, সাড়ে ছয় হাজার দেবে একশো টাকার নোটে। অনেক লস হবে। কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখলে আরও লস।'

অর্থনীতির এই অভূতপূর্ব নিয়ম ডুয়ার্সের বাণিজ্যে চালু হয়েছে বাস্তবতার বিচারে। কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা নগদে রেখে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা চেষ্টা করছেন পুরনো নোট বেচে দিতে। যদিও ব্যাঙ্ক থেকে এখন একটু বেশি মিলছে। কিন্তু সে-ও মিলছে দু'হাজার টাকার নোটে। এই গোলাপি রঙের কাগজটি ডুয়ার্সের হাটেবাজারে নিঃশব্দ উপদ্রব বটে! এই তল্লাটের গুটিকয়েক শহর-আধা শহরের বাইরে পাঁচশো টাকার নোট ভাঙিয়ে একশো টাকার বাজার করাই ছিল কঠিন, সেখানে দু'কিলোর নোট এক বিচিত্র রসিকতা। অনেক ক্ষেত্রে নির্মমও বটে। ফসল কাটার কাজ শেষ হয়েছে বিকেল চারটে নাগাদ। শ্রমিকরা মজুরি দিয়ে বাজার ঘুরে বাড়ি যাবেন। অথচ দিনের আলো ডুবে যাওয়ার পরেও দু'হাজারি নোট কীভাবে ভাগ করে নেবেন, সেই আলোচনায় দিনের আলো শেষের পথে। খেত মালিকের ছেলে বলছে, পেটিএম দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে। শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। কিন্তু তারপর?

'টাকার জন্য সারাদিন খাটি দাদা! এর পর টাকা তোলার জন্য খাটতে হচ্ছে। এটিএম দিয়ে টাকা তুলতে গেলে টাউনে যেতে হবে। দিনটাই নষ্ট।' একটি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা সামনে হতাশ মুখে বলছিলেন কামাখ্যাগুড়ির এক যুবক। টাকা বাতিলের আগে ডুয়ার্সে শহরের বাইরে থাকা হাতে গোনা এটিএম যন্ত্রে নোট মিলত সপ্তাহে দুই-একদিন। ইদানীং সেসব যন্ত্র স্রেফ 'শোপিস' হয়ে আছে। এই অবস্থায় মানুষকে ডেবিট কার্ড নিয়ে আসতে হচ্ছে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, মাথাভাঙার মতো শহুরে এলাকায়। গোটা দিন যাতায়াত এবং এটিএম লাইনে দাঁড়িয়ে নষ্ট করার পর মিলছে দু'হাজার টাকা। শীতের মুখে ডুয়ার্সে আলু সমেত রবি শস্য চাষের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, হাটেবাজারে শীতের সবজি যখন শোভা পাওয়ার জন্য মুখিয়ে, তখন নগদের এই অপ্রত্যাশিত অভাব আক্ষরিক অর্থেই যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

রাত প্রায় দশটা। শিলিগুড়িতে কাজের ধাক্কা সামলে ব্যাঙ্ক কর্মী বাস থেকে নেমেছেন জলপাইগুড়ির কদমতলায়। চায়ের দোকান খোলা পেয়ে এগিয়ে এসেছেন গলা ভেজাবার জন্য। কর্মক্ষেত্রে চেপে বসা সাম্প্রতিককালের টেনশন আর চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পরিচিত একজনের সঙ্গে দুটো কথা শুরু করতে না করতেই চলে এল 'ঐতিহাসিক' সিদ্ধান্তের কথা। ব্যাঙ্ক কর্মী মৃদু হেসে বললেন, 'ক্যাশলেস চালু হওয়াটা অবশ্যই ভাল কথা। কিন্তু জনগণকে পোঁদে

লাথি মেরে সে সিস্টেমে নিয়ে যাওয়াটা কি ডেমোক্র্যাটিক?' পাশে বসা আরেক খদ্দেরের মন্তব্য, 'মাপ করবেন দাদা আমাকে আবার বিজেপি-র সমর্থক ভাববেন না, কিন্তু এটাও ঠিক যে ডান্ডা না দেখালে আমাদের দেশে আইন কেউ মানতে চায় না। সবাই রাজার দেশে কেউ কি কারও কথা মানে বলে মনে হয়?'

'মোদিজি বলছেন যে ব্যাঙ্কে কত জমা করছেন, সেটা অটোমেটিক্যালি সেন্ট্রালের কাছে চলে যাবে। কিন্তু সেটা সিঙ্গল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে। কাল তিনটে আলাদা ব্যাঙ্কের আলাদা অ্যাকাউন্টে দুই লাখ করে ছ'লাখ ফেলে দিয়ে আসুন। সেন্ট্রালের কাছে অটোমেটিক কোনও ডেটাই যাবে না। প্যান চার্জ না করলে কিস্‌সু বার হবে না। সে সিস্টেম তো আগেও ছিল।'

শোনামাত্র শ্রোতা বিস্মিত। কিন্তু পালটা জবাব এল পাশ থেকে, 'মনে রাখবেন উনপঞ্চাশ হাজারের উপরে হলেই ব্যাঙ্কে প্যান নম্বর দিতে হয়। কাজেই দু লাখ করে একাধিক ব্যাঙ্কে ফেলে আপনি পার পাবেন না স্যার।'

'আরে, লোকে ইমোশনালি লাফাচ্ছে।' পরম আমোদে বলেছিলেন ধূপগুড়ির একটি ব্যবসায়ী সংগঠনের এক কর্তা, 'কালো টাকা সাদা হওয়ার লুপ হোল নিয়ে পাবলিক জানে না বলেই ভাবছে দারুণ কিছু হয়েছে।'

ধূপগুড়িতে মোদিজির ভক্তরা প্রধানমন্ত্রীর পুজো করে লাড্ডু খাওয়াচ্ছেন। সংগঠনের কর্তা সেই প্রসঙ্গে একচোট হেসে দিলেন উপরের প্রতিক্রিয়াটি। 'লাভ যদি হয়ে থাকে, তবে জাল নোটটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' তারপর মোদি-প্রসাদপ্রার্থীদের কটাক্ষ করে গম্ভীর হয়ে একটু কটু শব্দ প্রয়োগ করে বললেন, 'ওরা ধূপগুড়ির মার্কেটের কোনও খবর রাখে? এটা ডুয়ার্সের একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট হাট। আমরা সবাই মার খাচ্ছি দাদা।'

যদিও ডিসেম্বর, কিন্তু দিনের রোদ্দুর এখনও চড়া। নীল জামা পরা প্রৌঢ় নিজের লাইনটা রেখে গুনতে গিয়েছিলেন তাঁর আগে থাকা লোকের সংখ্যা। ফিরে এসে বিষণ্ণ মনে বললেন, 'আমি একশো তেতাল্লিশে। এটিএম-এর মেশিনটা স্লো। একটা ট্রানজাকশন হতে এক মিনিটের বেশি লাগছে।'

হিসেব করে বুঝলেন, অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের প্রতীক্ষা। পিছন থেকে কেউ উত্তেজিত স্বরে বলল, 'বিজেপি-র মেম্বারদের উচিত আমাদের হয়ে লাইনে দাঁড়ানো!'

লাইনে দাঁড়ানো নিয়মিত পাপক্ষয় হলেও উত্তেজিত হয়ে যাওয়া লাইনবন্দির সংখ্যা এখনও নগণ্য। এই লেখা পর্যন্ত ধৈর্য এবং সহ্যশক্তির পরীক্ষায় পাশ করে

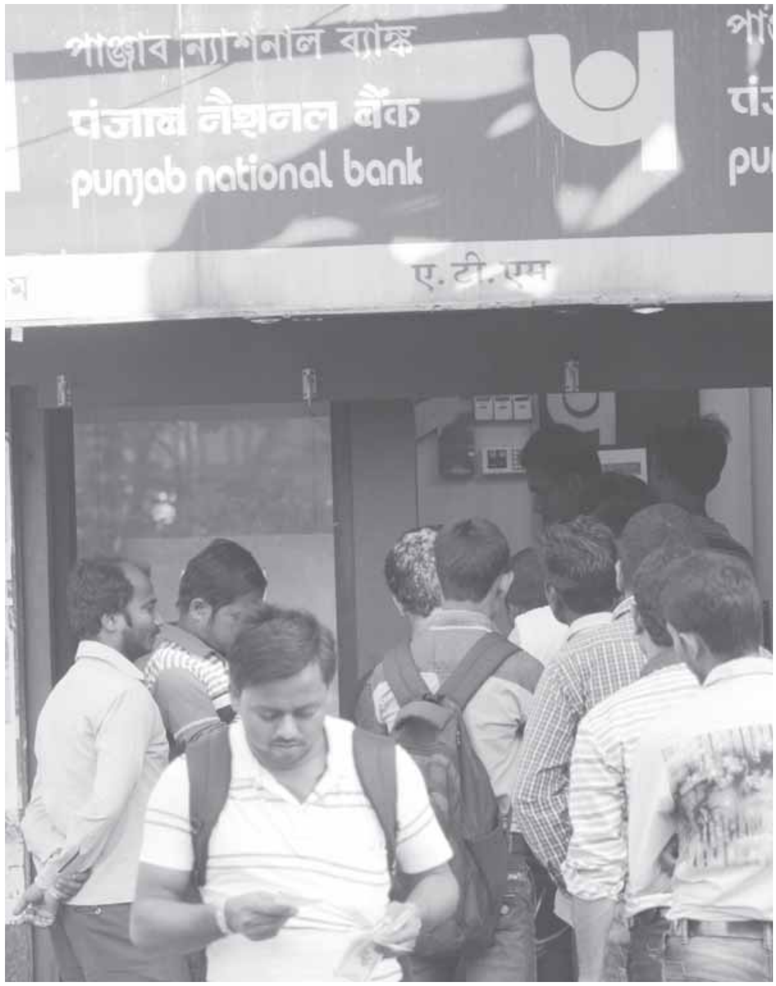

গিয়েছেন সিংহভাগ। গোড়াতে যাঁরা 'দেশের ভাল হবে' ভেবে লাইনে থাকার শক্তি সঞ্চয় করছিলেন, তাঁরা এখন চুপ। উপনির্বাচনে কোচবিহারে বিজেপি ভোট ভালই বাড়িয়েছে। সেকেন্ড হয়েছে তারা। বিরোধী শিবিরের দাবি, নোট বাতিলের কারণে ভোট বাড়েনি। তৃণমূল যেভাবে বিরোধীদের ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে, তাতে এটাই ছিল ভবিতব্য।

'মানুষ খেপে গিয়ে কী করবে?' বললেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান প্রতুল মজুমদার, 'লাইনে দাঁড়ানো মানুষ আসলে রাষ্ট্রশক্তির কাছে অসহায়। টাকা তোলার লাইনে কেউ গোলমাল করে না। এটা চাল কেনার লাইন হলে পরিস্থিতি মোটেই শান্ত থাকত না।'

এই কথাই অন্যভাবে বলতে গিয়ে মোবাইলে ইউটিউবের কয়েকটি ভিডিয়ো দেখালেন এক তরুণ। টাকা তোলার লাইনে মানুষের সংযমের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞর বক্তব্য। যার মূলসুর হল, টাকা তোলার লাইনে মানুষ শান্ত থাকছে বাধ্য হয়ে। 'দেশের ভাল হওয়া'র আবেগের পাশাপাশি নিজের টাকা নিজের হাতে রাখার বাস্তবতার দিকটা ভুলে গেলে চলবে না। এখানে আরও একটা জরুরি দিকও উঠে এল। আমজনতা কি ব্যাঙ্কে এর পর টাকা রাখবে?

নোট জোগানের পরিস্থিতি কালের নিয়মে স্বাভাবিক হয়ে আসবে ঠিকই। এটিএম-এ টাকা পর্যাপ্ত হবে একদিন। এখন কি প্লাস্টিক মানিতে চলে যাবেন ডুয়ার্সের জনতা? টোটোচালক পবন বর্মন বললেন, 'ভয় লাগে দাদা! আমি ক্যাশ বাড়িতেই রাখব।' মিষ্টির দোকানের মালিক সুরজবাবুও বললেন যে, ছেলেরা বলছে পেটিএম-এ দাম নিতে। কিন্তু নোট বাতিলের পরিস্থিতি দেখে ভাবছি, এখন নতুন টাকা যা হাতে আসছে, নগদেই রেখে দেব। পেটিএম-এ ছেলেছোকরারা কিছু কিনবে। কিন্তু নগদ ছাড়া গ্রামে চলবে কীভাবে? নোট বাতিলের আগে প্রায় বত্রিশ লক্ষ ডেবিট কার্ড বাতিল করেছিল দেশের ব্যাঙ্কগুলি। কারণ কার্ডের তথ্য পাচার হয়ে গিয়েছিল। ময়নাগুড়ির একটি পথসভার কোনও এক বক্তা সে বিষয়টি তুলে প্লাস্টিক মানির সুরক্ষা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন তীব্র ভাষায়।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩

মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮

চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫

আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়

তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০

মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮

দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

সোয়াইপ মেশিনে কার্ড ঘষার সুযোগ যেখানে আছে, সেখানে লিঙ্ক থাকবেই এমন কোনও মানে নেই। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখায় একটি করে এটিএম যন্ত্র থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সে নিয়ে কেউই ভাবছে না। দীর্ঘমেয়াদি লাভের আশ্বাসে মত্ত হয়ে কে চাইবে আজকের উপার্জন ছেড়ে দিতে? সত্যিই কি দীর্ঘমেয়াদে পাওয়া যাবে মেওয়া?

ডুয়ার্সে এক-আধজন পেটিএম মারফত টাকা নিচ্ছেন বলে দোকানের সামনে বিজ্ঞপ্তি ঝোলাতে শুরু করেছিলেন বটে। কাগজে এঁদের নাম-ছবিও বেরচ্ছিল। কিন্তু সহসা উক্ত কোম্পানির সঙ্গে চিন দেশের নাম জুড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

আসলে ডুয়ার্সে 'গ্যারান্টি নেই' এমন জিনিসকে বলা হয় 'চাইনিজ মাল'। স্বল্পশিক্ষিত অথবা শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষরা ডেবিট কার্ড এমনিতেই ব্যবহার করতে চান না ডুয়ার্সে। এটিএম যন্ত্রের অপ্রতুলতাও একটা কারণ। এর-তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার সংবাদ তাঁদের নগদ লেনদেনের দিকে আরও বেশি করে ঠেলে দেয়। বাস্তবে সেই নগদের অভাব একটা জ্বলন্ত সমস্যা।

জাল নোটের কারবারি এবং অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ডুয়ার্সে ডিমনিটাইজেশনের লিকার বেশ কড়া দেখাচ্ছে এখন। কেবল জলপাইগুড়ির দিনবাজারের মাছ ব্যবসায় ক্ষতির পরিমাণ ২৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আলুচাষিদের স্বস্তি দেওয়ার জন্য দু'টাকা কিলোতে দেওয়া হচ্ছে বীজ, অথচ চাহিদা আশানুরূপ হয়নি। ডুয়ার্সের গ্রামগুলিতে গেলেই চোখে পড়বে, বহু খেত এখনও নতুন করে চষাই হয়নি। আগের চাষের জের রয়ে গিয়েছে এখনও। বড়ই আতান্তরে পড়েছেন উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজকরা। শীত জুড়ে ডুয়ার্সে কীর্তন, যাত্রা, পালাটিয়া, ভাওয়াইয়া ইত্যাদির আসর জমে ওঠে গ্রামে গ্রামে। স্থানীয় লোকশিল্পী, যাত্রাদলের কিছু নগদপ্রাপ্তি ঘটে। এ জিনিস নগদ ছাড়া সম্ভব নয়। আপাতত এ নিয়ে কেউ ভাবতেই পারছেন না। 'কলকাতার যাত্রা পার্টিগুলি অনেক কম নিয়ে শো করতে চাইছে। তবুও সাহস পাচ্ছি না।' জানালেন রামশাই এলাকার এক উদ্যোক্তা। শহরে কাজ করে নগদ মজুরি নিয়ে ফেরা লোকগুলোও বিমর্ষ। নির্মাণকাজের শ্রমিকদের কপাল পুড়েছে। এমনিতেই পুজোর আগে নদী থেকে বালি-পাথর তোলায় নিষেধাজ্ঞার কারণে তাঁরা অনেকদিন বেকার ছিলেন। এখন নগদের অভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ডুয়ার্সের অসংখ্য ছোটবড় নির্মাণ। মায় ফোর লেন তৈরির কাজও।

কিন্তু ডুয়ার্সে কালো টাকা উদ্ধারের খবর কী? দু'-চার কোটি পুরনো নোটসহ দু'-চারজনের গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া আর কোনও আশার বাণী পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন নোট জোগাড়ের আশায় কেএলও জঙ্গিরা কি অ্যাকশনে নামবে? নেপাল হয়ে আসা প্যান কার্ড বিনে সোনা কেনা কি থেমে গেল? ভুটান সীমান্তে আবার চালু হয়ে গিয়েছে ভুটানি নোটের হস্তান্তর, কারণ 'উপায় নেই'।

তিস্তা থেকে সংকোশ পর্যন্ত বিস্তৃত ডুয়ার্সের সাধারণ জনজীবন দেশের সওয়াশো কোটি জনতার মতো অবশ্যই উপকৃত হবে, যদি কালো টাকাকে জব্দ করা যায়। অথচ মোদিজির অভিযান এখন অভিকেন্দ্র বদল করে 'ক্যাশলেস'-এর বিন্দুতে গিয়ে মিলতে চাইছে। কিন্তু এটা মোটেই ভোলা যাচ্ছে না যে ডুয়ার্স হল পিছিয়ে পড়া এলাকা। বহু এলাকায় ইন্টারনেট চলে শামুকের মতো। সোয়াইপ মেশিনে কার্ড ঘষার সুযোগ যেখানে আছে, সেখানে লিঙ্ক থাকবেই এমন কোনও মানে নেই। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখায় একটি করে এটিএম যন্ত্র থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সে নিয়ে কেউই ভাবছে না। দীর্ঘমেয়াদি লাভের আশ্বাসে মত্ত হয়ে কে চাইবে আজকের উপার্জন ছেড়ে দিতে? সত্যিই কি দীর্ঘমেয়াদে পাওয়া যাবে মেওয়া? সারা দেশের মতো ডুয়ার্সও ঘোর আশঙ্কায়। নগদনির্ভর অসংখ্য অতি সাধারণ ডুয়ার্সবাসীর কাছে এই শীত কি নতুন ধান, সবজি, কমলালেবু আর উৎসব-মেলায় মুখর হয়ে উঠবে? পর্যটনে শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকগুলো কি হাসতে পারবেন? ডুয়ার্সে বইমেলার মরশুম এখন। কিন্তু শিলিগুড়িতে হয়ে যাওয়া উত্তরবঙ্গ বইমেলার অভিজ্ঞতা খুব একটা ভাল সংকেত পৌঁছে দেয়নি। আসছে নতুন ক্লাসের বই কেনার সময়। দীর্ঘমেয়াদের মেয়াদ শেষ হবে কবে? নাকি অর্থনীতিবিদ কেইনসের কথা তুলে এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথাই সত্যি হবে, দীর্ঘমেয়াদে আমরা আসলে মারা যাব।

শীত এখনও জমিয়ে পড়েনি, কিন্তু এক হিমশীতল আশঙ্কায় থম মেরে গিয়েছেন ডুয়ার্সবাসী।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

আমরা কি অবশেষে সত্যযুগে প্রবেশ করিতেছি?

প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচিতে ধ্যানমগ্ন দেবর্ষি ঈষৎ নড়াচড়া করে উঠলেন মনে হল। 'একবার চোখ দুটো খুলুন স্যার, ধ্যান ভেঙে একটু হেল্প করুন।' কানে এই বাক্যবন্ধ প্রবেশ করতেই দেবর্ষির দু'চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল। দীর্ঘ অনাহারে কোটরাগত দুই চোখে দেখা গেল কৌতুকের আভাস। দিব্যচোখে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, দেশ জুড়ে অসংখ্য মানুষ নাওয়া-খাওয়া ভুলে হকের জমানো অর্থ থেকে কিঞ্চিৎ ব্যবহারের অভিপ্রায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে। তারপরই হঠাৎ চোখে পড়ল, তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে এক ছোকরা। এতক্ষণ চেঁচামেচি সে-ই করছিল তাহলে! দেবর্ষির উৎসুক চাহনির উত্তরে সেই ছোকরাটি জানাল, সে একজন ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার, কোনও এক দুষ্প্রাপ্য পাখির সন্ধানে সে এই গহিন অরণ্যে ঢুকে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। দিনভর ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ এই ধ্যানমগ্ন দেবর্ষিকে চোখে পড়ে তার।

দেবর্ষির স্বগতোক্তি, 'লাইনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানবজাতি'। শুনে কোন লাইনের কথা বলছেন বুঝতে পেরে সেই ছোকরা আলটপকা মন্তব্য করে বসে, কেন, আপনারা সাধুবাবারাও তো হরিদ্বার-কাশী বা কুম্ভ মেলার লঙ্গরে লাইন লাগান, সেটাও কি শৃঙ্খলিত? একে শৃঙ্খল না বলে শৃঙ্খলা বলুন।

—বেশ তো, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ এইসব মানুষরা ঠিক কীসের আশায় লাইনে দাঁড়ায় বলতে পারো? নোটের? নাকি কোনও সমাধানের? প্রশ্ন রাখলেন দেবর্ষি।

—না বাবাজি, এ হল নয়া যুগের নিঃশব্দ নভেম্বর বিপ্লব। মানুষের এত দিনের অভ্যেস বদলে ফেলার বিপ্লব।

—সে কী! ক্যাশের মোহ ত্যাগ করতে পারলে তো কলির বিনাশ ঘটবে। সত্যযুগের সূচনা ঘটবে বৎস!

—যা বলেছেন হে সন্ন্যাসী! ওই নামে কী একটা কাগজও বেরয়। সবাই বলছে, এবার সেটা হিট করবে।

—তাহলে বলছ তোমাদের 'ডেবিট কার্ড'ই এই বিপ্লবের হাতিয়ার?

—একদম ঠিক কথা মহারাজ। অসৎ কালো টাকার ব্যাপারীদের ঠান্ডা করার জন্য এর চাইতে বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে বলুন?

—তাহলে বলছ ভোটের আগে পার্টির মোটা চাঁদা এখন থেকে অনলাইন ট্রান্সফার হবে? মাছ-সবজির বাজারে যারা তোলাবাজি করে, তারা হপ্তার টাকা তুলতে এখন থেকে কার্ড সোয়াইপ মেশিন বগলে নিয়ে ঘুরবে?

—আসলে সিন্ডিকেট-তোলাবাজ সবই হাওয়া হয়ে যাবে। অপরাধ কমে আসবে শূন্যের ঘরে।

—কিন্তু বৎস, শয়তানের সৃষ্টি তো ভগবানের সঙ্গেই। সুতরাং এই ধরাধাম যদ্দিন আছে, শয়তানি বা অপরাধ ততদিন থাকবে। ঠিক বলছি কি না?

—তা ঠিকই বলেছেন বাবা। কিন্তু টাকা না পেলে তারা অপরাধ করবে কেন বলুন!

—কেন? ঠগবাজি বা ফেরেববাজি যাদের পেশা, তারা কোথায় যাবে? যারা কাঠ

> ‘খালি চোখে তেমন কিছু ধরা পড়ছে না বাছা। মনে হচ্ছে, সবই আগের মতো ঠিকঠাক। তবে অনলাইন কেনাবেচা বেড়ে গিয়েছে বহু গুণ। দেশের তাবড় শিল্পপতিরা অনলাইন বাণিজ্যের দোকান খুলেছেন, যাঁরা এদ্দিন দেশের সরকার চালাতেন বলে শোনা যায়! হ্যাঁ, অনলাইন ডিসকাউন্ট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেটাই তো স্বাভাবিক।’

পাচার, জন্তু পাচার, অস্ত্র পাচার করে খায়, তারা কী করে বাঁচবে বলো? ক্যাশের অভাবে পকেটমাররা হয়ত পেশা পালটাবে, কিন্তু অপরাধ যাদের নেশা, তারা সব কি হাওয়া হয়ে যাবে? ধর্ষণকামী পুরুষ, নকল ওষুধ বা নকল গোদুগ্ধ বিক্রেতা— এরা সব কি তাড়াতাড়ি উবে যাবে?

ছোকরা এবার মাথা চুলকায় খানিকক্ষণ। তারপর বলে, ‘কিন্তু যারা ক্যাশ টাকার বিনিময়ে খুন করে বা দাঙ্গা বাধায়, তাদেরকে তো নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে!’

দেবর্ষির পালটা প্রশ্ন, ‘কেন? কী করে? তাদেরকেও চেকে পেমেন্ট করলে অসুবিধে কোথায়? খুনের জন্যই পেমেন্ট হচ্ছে তা ধরবে কীভাবে? প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে রাস্তার ধারে ভারতীয় পতাকা নিয়ে সার দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ানোর জন্য যদি ইভেন্ট ম্যানেজার মারফত হাজারকয়েক লোকের অ্যাকাউন্টে চেক বা অনলাইন পেমেন্ট হতে পারে, তবে দেশের কোনও প্রান্তে বোমা ফাটানোর জন্য বা জঙ্গি হানা আয়োজন বাবদ কোনও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে কেউ চেকে পেমেন্ট করলে তা যে সেই নাশকতার জন্যই করা হয়েছে তা প্রমাণ করার কোনও উপায় আছে কি? কিংবা মাদকদ্রব্য বিক্রেতাকে অনলাইন বা চেক মারফত টাকা দিলে তা যে মাদকদ্রব্যের জন্যই, সেটা ধরবার কোনও রাস্তা বা আইন আছে কি তোমাদের?’

—যাচ্চলে, এসব কী কথা শোনাচ্ছেন সাধুবাবা? আমি তো ভাবলাম আপনি প্রধানমন্ত্রীর দলের লোক। এখন তো দেখছি উলটো গাইছেন। তবে দেশের বড় বড় নেতা একে সমর্থন করছেন কেন? উঁচু একটা পাথর দেখে তার উপর বসে পড়ল ছোকরা।

তা-ই দেখে সাধুবাবা পদ্মাসন ত্যাগ করে এবার পিছনের পাথরে একটু হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসলেন। ‘খোলাখুলি এসব কি কেউ বিরোধিতা করে? মানুষ এখন ভাবের ঘোরে রয়েছে। নিজের শত অসুবিধা হলেও ধনীদের কালা ধনের সাড়ে সব্বনাশ হয়েছে ভেবেই আহ্লাদে আটখানা। এ সময় কি কেউ তার বিরুদ্ধে বলে? পাগল নাকি?’

—এ কথাই যদি বলেন সাধুজি, তো আমাদের দিদি এর বিরুদ্ধে একাই এত চেঁচামেচি করছেন কেন? উনি কি তবে পা... বেশ চেপে ধরার ঢঙে বলল সেই ছোকরা।

এবার খানিক শরীর কাঁপিয়ে হাসলেন ঋষি। বহুদিন খাওয়াদাওয়া নেই বলে কাশির দমকও থাকল কিছুক্ষণ। ছোকরা ব্যাগ থেকে জলের বোতল বাড়িয়ে দিতে সেই জলপান করে তবে থামল। মুখ মুছে দেবর্ষি বললেন, ‘দেখো বাবা, এ হচ্ছে রাজনীতির ময়দান। আমরা সব চারপাশের দর্শক, ট্যাক্স নামক চড়া দামের টিকিট কেটে খেলা দেখি। এ সময় মোদি দুর্দান্ত খেলছেন, গোটা পৃথিবীই আমোদিত তাঁর ক্রীড়াশৈলীতে, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাকিরা খারাপ খেলোয়াড়। দিদি ক্রমাগত চেঁচামেচি করছেন দেখে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নানারকম ঠাট্টামূলক ব্যাখ্যা করছেন। দিদি সেসব যে অবহিত নন তা ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তবুও তিনি ডোন্ট কেয়ার, একই রকম প্রতিবাদী।’

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, জাতীয় স্তরে প্রধান বিরোধী মুখ হওয়ার এর চাইতে ভাল সময় আর আসবে না। তাই সে সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাইছেন না।

মাঝখানে হড়বড় করে ওঠায় বিরক্ত হলেন দেবর্ষি— এই হল বাঙালি মনুষ্যদের রোগ, তারা সব জানে। মনে রাখবে, এর আগে সিঙ্গুরে মোটরগাড়ির কারখানা হচ্ছে শুনে দিদি কিন্তু একাই চেঁচামেচি শুরু করেছিলেন। রাজ্যের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শত ঠাট্টাতামাশাতেও তিনি হাল ছাড়েননি। এখানেও তেমনই এমন কিছু আপত্তিকর গন্ধ তিনি পেয়েছেন যে কিছুতেই থামতে চাইছেন না। আরও একটা ব্যাপার মাথায় রাখবে, ভোটের অঙ্কে তিনি এখন প্রখর মেধাসম্পন্না, তাই তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই অনেক দূরের কথা ভেবে নেওয়া। তোমাদের মতো বুদ্ধিজীবীরা কিংবা দেশের সেনাবাহিনী কী খারাপ ভাবল তাতে ওঁর কিছুই যায় আসে না। সত্যি কথা বলতে এরা কেউই ওঁর টার্গেট ভোটার নয়।

—একটু খোলসা করে বলুন না সাধু মহারাজ। আপনি তো ত্রিকালদর্শী সাধক। ছোকরা অনুনয় করল।

কিন্তু দেবর্ষি তাঁর শুভ্র দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে মিচকি হেসে বললেন, ‘আজকে যা অনুমান, কাল তা সত্যে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ কিন্তু মোদি ও দিদি দু'জনের। আবার বলছি, আমরা তো দর্শকমাত্র।’

ছেলেটি এবার উঠে দাঁড়ায়। স্পষ্টতই হতাশ। ‘তার মানে আপনার মতে এইসব সিদ্ধান্তের আসলে কোনও সুফলই নেই? মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে?’

এবার একটু নরম হলেন দেবর্ষি, ‘নোট বাতিলে সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ খাওয়া আপাতত কম হবে। কিন্তু ক্যাশ না দিলে ভবিষ্যতে কাজ যে তারা করবেই, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? জঙ্গিদের হাতে ক্যাশের জোগান না থাকলে নাশকতামূলক কাজকর্মে ভাটা পড়বে কিছুদিনের জন্য। রাজনীতিতে অপরাধীদের দাপট কমলেও তার মুনাফা তোলা এখুনি সম্ভব নয়। কারণ, রাজনীতিতে ঠিকঠাক সৎ লোকজন আসা বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে বন্ধই হয়ে গিয়েছে। অতএব রাজ্য বা দেশ চালাবে কারা? তবে হ্যাঁ, মনোভাব একই রকম কঠিন রাখলে ভবিষ্যতে হয়ত তার সুফল পাওয়া যাবে। শেষন সাহেবের পরে এই মোদি সাহেবকে দেখছি বেশ একগুঁয়ে। কাজ হলেও হতে পারে।’

—তার মানে, আপনার মতে সত্যযুগ আসার চান্স একেবারেই নেই, তা-ই তো?

—দেখো, এই সত্যযুগের মোড়কে বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রোডাক্ট বাজারে নামানোটাই কিন্তু যথেষ্ট সাহসের ব্যাপার, মানতে হবে! সেই সাহসটাকেই ভয় পাচ্ছে অন্যরা। পালের হাওয়া অন্য কেউ কেড়ে নিলে রাগ তো হবেই বাছাধন।

—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। এখান থেকে ফেরার রাস্তাটা দেখিয়ে দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত বলুন, অদূর ভবিষ্যতে আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন?

সাধুবাবা আবার শূন্যে দৃষ্টি ফেরালেন। খানিক বাদে ঠোঁট উলটে বললেন, ‘খালি চোখে তেমন কিছু ধরা পড়ছে না বাছা। মনে হচ্ছে, সবই আগের মতো চলছে। তবে অনলাইন কেনাবেচা বেড়ে গিয়েছে বহু গুণ। দেশের তাবড় শিল্পপতিরা অনলাইন বাণিজ্যের দোকান খুলেছেন, যাঁরা এদ্দিন দেশের সরকার চালাতেন বলে শোনা যায়! হ্যাঁ, অনলাইন ডিসকাউন্ট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেটাই তো স্বাভাবিক। ক্যাশ টাকা পকেটে থাকলে দরাদরি করার যে প্রবৃত্তি বা শক্তি থাকে, অনলাইন তা অন্তর্হিত হয়। সত্যযুগে প্রবেশ করলেও সরকার চালাতে, দল চালাতে, ভোটে জিততে সেই অর্থের প্রয়োজন তো থাকবেই, তা-ই না! আর লোভ-লালসা না থাকলে মনুষ্য অস্তিত্বই তো বৃথা।’

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

দেবদেবীর পুজো ঘিরে মেলা ও উৎসব ছিল বন্যজন্তু আর মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই

কখনও কোনও মজে যাওয়া নদীকে ঘিরে, কখনও কোনও জনপদে বা পাহাড়ে, বহুদিন ধরে চলে আসা গ্রামীণ মেলাগুলি আজও বয়ে চলে প্রাচীন লোককথা বা ইতিহাস। নানা সংস্কৃতির ধারা বারবার এসে মিশেছে ডুয়ার্সে, তার খোঁজখবর মেলে এইসব মেলাতেই। আজ শেষ পর্বে সেসবেরই হদিশ দিচ্ছেন **গৌতম গুহ রায়**।

মহাকাল শিবের আরাধনা

কালী পূজাকে কেন্দ্র করে যেমন নানা মাপের মেলা বসছে, তেমনি জেলার আর-এক আরাধ্য মহাকাল বা শিবের আরাধনাও হয় অনেক জায়গায়। জল্পেশের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এমনই আর-এক উল্লেখযোগ্য মেলা হয় ফাল্গুন মাসেই— দোলপূর্ণিমায় আলিপুরদুয়ারের খাগরা গ্রামের মহাকালের মেলা। প্রায় একশো বছর হতে চলেছে এই মেলাটির বয়স। এই ব্লকেরই চেপানি গ্রামে ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার মহাকালদেবের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন জমিতে তিন দিন ধরে মেলা বসে। এখানে আলিপুরদুয়ার ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ শামিল হন। পূজা কেন্দ্রীয় মেলা হলেও আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে যাত্রাগান থেকে বিষহরা গান প্রভৃতি। কৃষ্ণযাত্রার গান, ভাওয়ালের গানও এই মেলার আকর্ষণ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে ‘পশ্চিমবঙ্গে পূজাপার্বণ ও উৎসব’ গ্রন্থে। চেপানি গ্রামের মহাকালের মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। পার্শ্ববর্তী নদী ছুঁয়ে অনেকটা জমি নিয়ে এই মন্দির। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষই এর পূজা করেন। এখানেও পূজা শেষে মানত অনুযায়ী ডিম, মুরগি, পায়রা, পাঁঠা বলিপ্রদত্ত হয়। এর কাছেই রয়েছে তালেশ্বরের মেলা। তালেশ্বরগুড়িতে মহাকাল বা শিব ওই নামে অধিষ্ঠিত। চৈত্রসংক্রান্তিতে এই মেলা বসে। এই তালেশ্বরের উল্লেখ স্যান্ডার্সের রিপোর্টে আছে। স্থানীয় খাগরা গ্রামের এক মেলারও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিন থেকে দু’-তিন দিন এই মেলা বসে। চিঁড়ে, গুড়, দুধ, কলা দিয়ে মহাকালের অর্ঘ্য সাজানো হয়। দ্বিতীয় দিন প্রদত্ত হয় বলি। পায়রা থেকে পাঁঠা উৎসর্গিত হয়।

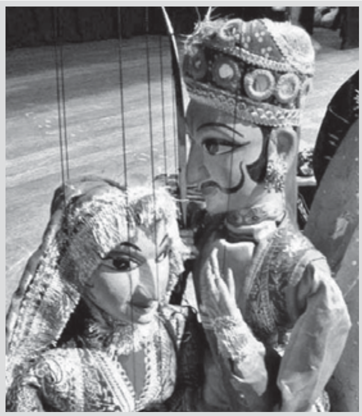

ময়নাগুড়িতে জল্পেশ ছাড়াও শিবের আরও বেশ কয়েকটি আরাধ্য রূপ রয়েছে। এমনই একটি ধূমবাবা। কাঁঠালবাড়ি গ্রামে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে ধূমবাবার পূজা হয়। ধূমবাবার কোনও মূর্তি নেই, কয়েক খণ্ড পাথরকেই শিবজ্ঞানে পূজা করা হয়। এই ধূমবাবাকে নিয়ে একটি লোককাহিনিও রয়েছে। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথ নির্মাণকালে দোমোহানি থেকে লাটাগুড়ি সংযোগকারী রেলপথটি ধূমবাবার থানের উপর দিয়ে যায়।

ভুটান সীমান্তের মহাকাল ধামকে ঘিরেও মেলা বসে শিবরাত্রি উপলক্ষে। কালচিনি থানার অন্তর্গত এই মহাকাল মন্দিরটি জয়ন্তি থেকে ৫/৬ মাইল দূরবর্তী। এই মেলা উপলক্ষে জনসমাগম উল্লেখযোগ্য। তিন দিন ধরে এই মেলা হয়। মহাকালের গুহাটি আসলে চুনাপাথরজাত স্ট্যালাকটাইটের ঝুড়িবিশেষ। উঁচু পাহাড়ের মাথায় এই গুহার মহাকাল মন্দিরটি এক বিখ্যাত তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। একসময় এর কাছেই বক্সাতে ভুটানের সঙ্গে ব্রিটিশ শান্তি চুক্তি অনুযায়ী লেনদেন ঘটত। বক্সার নিকটবর্তী জয়ন্তির মহাকাল। এই মহাকাল পূজায় কোনওরকম বলি চলে না। পূজার পুরোহিত বিহারী মহন্ত। দুর্গম হলেও মেলা উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয়। একসময় এখানে ভুটানের ব্যাপারীরা তাঁদের সামগ্রী নিয়ে আসতেন, হত আদানপ্রদান। আজও ভুটানিরা মেলায় আসেন।

ময়নাগুড়িতে জল্পেশ ছাড়াও শিবের আরও বেশ কয়েকটি আরাধ্য রূপ রয়েছে। এমনই একটি ধূমবাবা। কাঁঠালবাড়ি গ্রামে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে ধূমবাবার পূজা হয়। ধূমবাবার কোনও মূর্তি নেই, কয়েক খণ্ড পাথরকেই শিবজ্ঞানে পূজা করা হয়। এই ধূমবাবাকে নিয়ে একটি লোককাহিনিও রয়েছে। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথ নির্মাণকালে দোমোহানি থেকে লাটাগুড়ি সংযোগকারী রেলপথটি ধূমবাবার থানের উপর দিয়ে যায়। এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজন কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এর ফলে স্থানীয় মানুষজন বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে বাবা কুপিত হয়েছেন। এর পর ধূমবাবা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। শিবরাত্রি থেকে তিন দিন এখানে উৎসব চলে। একদিন অহোরাত্র নামযজ্ঞ হয়। কাঁচা দুধ, চাল, কলা, তেল, সিঁদুর দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও চৈত্র-বৈশাখ মাসে ধান কাটার পর ধূমবাবার পূজা দেওয়া হয়। তবে ক্রমশ

এর জৌলুস কমছে, কমছে আয়োজন।

মহাকাল শিবের পূজা উপলক্ষে জেলায় আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় উৎসব বা মেলার আয়োজন করা হয়। এরকমই আর একটি আলিপুরদুয়ারের মহাকালগুড়ির মহাকাল মন্দিরকে ঘিরে অনুষ্ঠেয় মেলা। শিবরাত্রিতে এই উৎসব হয়। এদিন মহাকালের কাছে হাঁস, পাঁঠা প্রভৃতি মানত ও বলি দেওয়া হয়। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের গোঁসাইয়ের পূজা করেন।

বনদুর্গা ভাণ্ডারণী পুজো

ময়নাগুড়ি থেকে কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে দেবী ভাণ্ডানী বা কারও কারও মতে বনদুর্গার পূজার প্রচলন রয়েছে। একে ঘিরে প্রতিটি জায়গাতেই মেলার আয়োজন করা হয়। এখনও জাঁকজমকপূর্ণভাবে ভাণ্ডানী বা ভাণ্ডালী পূজা ও মেলা যেসব জায়গায় হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ি, বার্নিশ, ধূপগুড়ির ভাণ্ডানী, আলিপুরের যোগেন্দ্রনগরের মেলা। এই ভাণ্ডানী উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী, বেশ কয়েকটি নামে পরিচিত— ভাণ্ডানী, ভাণ্ডারনী, ভাণ্ডালী। নাগরিক গবেষকরা বনদুর্গা বলে পরিচিতি দেন। এঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এঁর পূজা প্রচলনের লোককাহিনি। এই দেবীর পূজার প্রচলন নিয়ে অনেকগুলো জনশ্রুতি রয়েছে, তার কাহিনিও ভিন্নরকম। আলিপুরদুয়ারের যোগেন্দ্রনগরে পূজিত ভাণ্ডালী দেবী সম্পর্কে যে মিথ রয়েছে তা এরকম— ভাণ্ডালী দেবী দুর্গার বোন। শারদীয়া দশমী তিথিতে দুর্গা মর্তের পূজান্তে স্বগৃহে ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে বোনের সঙ্গে দেখা হয়। দুর্গা পূজার সংবাদ পেয়ে এবং নিজে পূজা না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলে দুর্গাদেবী তাঁকে সান্ত্বনা দেন যে, পরদিন অর্থাৎ একাদশীর দিন মর্তে তাঁর পূজা হবে। এর থেকেই একাদশীর দিন তাঁর পূজার প্রচলন শুরু হয়। আবার ময়নাগুড়ির প্রচলিত মিথ অন্যরকম। কোচবিহারের রাজবাড়িতে দুর্গা পূজার পর বিজয়াদশমী তিথিতে দেবী দুর্গার মর্ত থেকে কৈলাস যাওয়ার সময় তাঁর মালপত্র তত্ত্বাবধানকারী ভাণ্ডারনী পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবীকে আরও তিন দিন মর্তে অবস্থান করতে হয়। এই কারণেই পুনরায় তাঁর পূজা হয়। ভাণ্ডারনীকে উপলক্ষ করে এই পূজা বলেই এর নাম ভাণ্ডারনী পূজা। বিজয়াদশমীর দিন বার্নিশে হয় ভাণ্ডারনী পূজা। এর পর দু'দিন আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় হয় বাশিয়া ভাণ্ডারনী বা বাশি ভাণ্ডারনী পূজা। আরও একটি মিথ প্রচলিত আছে যে, একসময় নহুষ নামে জনৈক রাজা রাজপ্রাসাদে শারদীয়া দুর্গা পূজার আয়োজন করে শিকারে বার হন। শিকারের আনন্দে দুর্গা পূজার কথা ভুলে যান তিনি। এদিকে রাজবাড়িতে যথারীতি পূজার পর দশমী তিথিতে দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়, কিন্তু দেবী রাজার পুষ্পাঞ্জলি চান। রাজা বনমধ্যে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দেন। সেই থেকে ওই একাদশী তিথিতে দেবীর আরাধনা শুরু হয়। এই পূজা ভাণ্ডানী পূজা বলে খ্যাত হয়।

উপরের কাহিনিগুলোর ভিন্নতা দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এইসব লোককাহিনি তৈরি হয়েছে। আসলে ভাণ্ডানী এই অঞ্চলের এক লৌকিক দেবী, অরণ্যসংকুল ও বন্য জন্তুর বিপদের সামনে অসহায় মানুষের সৃষ্ট দেবীবিশেষ। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়ের এ বিষয়ে অভিমত এই যে, 'প্রকৃত বিচারে ভাণ্ডানী বনদুর্গা, মহাকাল, দক্ষিণরায়, সোনারায়, শালশিরি প্রভৃতি দেবদেবীর ন্যায় একজন অরণ্যদেবতাবিশেষ না ভাবিবার কোনও উপায় থাকে না।'

ময়নাগুড়ি থেকে কামাখ্যাগুড়ি— সর্বত্রই প্রায় এই দেবীর পূজারি স্থানীয় রাজবংশী অধিকারী, মন্ত্রও লোককথায়। একসময় ভাণ্ডানীদেবী একাই পূজা পেতেন এবং দ্বিভুজা ও ব্যাঘ্রবাহিনী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ পূজার বারোয়ারি আয়োজকরা একে আধুনিক দুর্গা বানিয়ে ফেলছেন। চার পুত্র-কন্যা জুড়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাঘের জায়গায় সিংহ চলে এসেছে। দ্বিভুজা দেবী অনেক স্থানেই চতুর্ভুজা, তবে ইদানীং দশভুজাও হয়ে গিয়েছেন। যা-ই হোক, পরিবর্তন-বিবর্তন সত্ত্বেও এই দেবী আজও গ্রামীণ জলপাইগুড়ি কোচবিহারের অন্যতম আরাধ্যা দেবী। পূজা ও মেলার হাত ধরে শারদীয়ার উৎসব অন্য রূপে।

ময়নাগুড়ি থেকে কামাখ্যাগুড়ি— সর্বত্রই প্রায় এই দেবীর পূজারি স্থানীয় রাজবংশী অধিকারী, মন্ত্রও লোককথায়। একসময় ভাণ্ডানীদেবী একাই পূজা পেতেন এবং দ্বিভুজা ও ব্যাঘ্রবাহিনী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ পূজার বারোয়ারি আয়োজকরা একে আধুনিক দুর্গা বানিয়ে ফেলছেন।

তিস্তা নদীর পূর্ব পাড়ের বার্নিশ ঘাট একসময় জলপাইগুড়ি শহরের সঙ্গে ফেরি যোগাযোগের সূত্র ছিল। ১৯৬৮-র প্লাবনের পর বার্নিশ বিচ্ছিন্ন। সেই বার্নিশ থেকে ময়নাগুড়ি রোড স্টেশনের পথে জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রধান ভাণ্ডানী পূজার মেলা বসে। বিজয়াদশমীতে একদিনের এই মেলাতে এখনও গ্রাম্য চেহারা থাকলেও মেলা শুধু বিকিকিনির হাটই হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। পূজাস্থানের সামনের মাঠ ও রাস্তার দুই ধারে মেলা। মেলা পরিচালনায় স্থানীয় কমিটি তৈরি হয়েছে। পূজার বিষয়টির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সেবাইতের ব্যক্তিগত। প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন এই মেলার পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণও রয়েছে। পদমতি, মাধবডাঙা, ময়নাগুড়ি, ধর্মপুর প্রভৃতি জায়গায় মানুষজন ছাড়াও দূরদূরান্তের মানুষ এই মেলায় হাজির হন নাড়ির টানে। তবে সাম্প্রতিককালে এই ভাণ্ডানীমূর্তি তার পুরনো চেহারা পালটে সন্তানসন্ততিসহ সিংহবাহিনী দুর্গার চেহারা নিয়েছে। পূজায় সহস্রাধিক পায়রা উৎসর্গিত হয়। প্রাচীনকালের মতোই রাজবংশী লোকভাষায় পূজার মন্ত্র উচ্চারিত হয়। বার্নিশের ভাণ্ডানীর মতোই আরও একটি উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডানী বা ভাণ্ডালী পূজা আলিপুরদুয়ারের যোগেন্দ্র নগরের ভাণ্ডালী পূজা। এখানে বিজয়ার পর একাদশী তিথিতে এই পূজা হয়। দুর্গা পূজার মতোই মহাসমারোহে এই পূজা হয়। এখানেও দেবী সিংহবাহিনী কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী বেষ্টিতা হয়ে গিয়েছেন। তবে চতুর্ভুজা এই দেবী পূজার মন্ত্র জগদ্ধাত্রী পূজার অনুরূপ। এই জমিতে তিনটি ঘর নিয়ে মণ্ডপ। পূজা উপলক্ষে ভোগ রাঁধা হয়, যা সর্বসাধারণের জন্য। সন্ধিপূজা ও অষ্টমী পূজায় বলিও দেওয়া হয়। মেলা চলে সেখানে তিন দিন। মেলায় গ্রাম্য চরিত্র বজায় আছে অদ্যাবধি। এখানে যাত্রাপালার আয়োজনও হয়। কুমারগ্রাম থানার পশ্চিম নারাথলি গ্রামেও ভাণ্ডানী পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। দশমীর চার দিন পরে স্থানীয় মানুষজনের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন হয়। মেলার ব্যাপ্তি ততটা না হলেও প্রাচীনত্ব রয়েছে। মূলত মনিহারি দোকান, খাওয়াদাওয়ার দোকান ছাড়াও লোকগান ও পালাগানের আসর এর আকর্ষণ। ধূপগুড়ির ভাণ্ডানী গ্রামেও বিজয়াদশমীর পরদিন ভাণ্ডানী পূজা ও এই উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। এটিও দেড়শতাধিক বছরের প্রাচীন মেলা। পাকা মন্দিরে দেবী ভাণ্ডানীমূর্তিটি আজ দুর্গার অনুরূপ চেহারার হলেও ব্যাঘ্রাসীন ও দ্বিভুজা। পায়রা, পাখি, পাঁঠাবলি দেওয়া হয় ও সর্বজনীন ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের

ব্যবস্থাও করেন পূজার আয়োজকরা। সেবাইত রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মন্ত্র লোকভাষায়। এই মেলার সূচনাও দেড়শো বছর আগে হয়েছিল, উদ্যোক্তা ছিলেন দক্ষিণ উল্লাডাবরীর ধীরদেব মল্লিক।

মাল ব্লকের ক্রান্তিতে ভাণ্ডা ঠাকুর বা ভাণ্ডারীর পূজা উপলক্ষে ইদানীং বেশ জমজমাটি মেলা বসছে। পুরুষ ঠাকুর। প্রায় সত্তর বছরের পুরনো এই পূজা ও মেলা, তবে মেলার এই জৌলুস খুব বেশি দিনের নয়। ভাণ্ডা ঠাকুর, যাঁকে উপলক্ষ করে এই মেলা, তার মূর্তিতে দুর্গার ছায়া মিশেছে। ভাণ্ডা আসলে যক্ষ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাহারা দেন তিনি। বাঘের পিঠে আসীন, দু'পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী ও কার্তিক-গণেশ। পূজারির স্বপ্নাদেশে এই দেবতামূর্তি রচিত হয়েছে। অনেকের মতে, এই এলাকার ভাণ্ডী গাছের থেকে ভাণ্ডা ঠাকুরের নাম এসেছে। আগে একটি মাটির ঢিপি ছিল, জঙ্গল ঘেরা, এখানেই পুজোর সূচনা হয়েছিল। লক্ষ্মীর পূজার সময় কার্তিক মাসে সাধারণত এই পূজা ও মেলা হয়, এক সপ্তাহ ধরে চলে এই মেলা। সম্প্রতি মেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে একে সুসম্পন্ন করতে মেলা পরিচালনায় যুক্ত হয়েছে মাল পঞ্চায়েত সমিতি। এই মেলায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ অংশ নেন। পাশেই কাঠামবাড়ি, মেচদের গ্রাম। মেচরাও এই মেলায় অংশ নেন। পায়রা প্রভৃতি বলি হয়, তবে আগে বলি হত না। মেলাকে কেন্দ্র করে মাল, ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এই উৎসবে মেতে ওঠেন।

সর্পদেবী মনসার পুজো

এক সময়ের অরণ্যসংকুল এই জেলায় ব্যাঘ্রবাহিনী ভাণ্ডানীর মতোই পূজিত হয়ে আসছেন সর্পদেবী মনসা। গোটা উত্তরবাংলাতেই মনসা এক গুরুত্বপূর্ণ দেবী। জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে মনসা পূজা উপলক্ষে রায়কত বংশের সূচনালগ্ন থেকে পূজা ও মেলার আয়োজন করা হয় বলে অনুমান। মনসা নিছক দেবী নন, এক শিকড় আছে এখানকার লোকসংস্কৃতিতে, এখানকার জীবনচর্যাতেও। শুধু উত্তরবাংলা নয়, 'সর্প পূজা'র প্রচলন গোটা দেশে রয়েছে। 'Encyclopaedia of Religion and Ethics'-এ উল্লেখ আছে গোটা বিশ্বে ব্যাপ্ত লোকবিশ্বাস ও আরাধ্য হিসেবে সর্পদেবতার। ইলিয়ট স্মিথের মতে খ্রিস্টের জন্মের ৮০০ বছর আগে মিশরে এর পূজা শুরু হয়। আমাদের মনসামঙ্গল এবং এই অঞ্চলের বিষহরা গান সাপদেবতার মিথকে বহন করছে। সাপের দেবী মনসা, যিনি শিবের কন্যা। মনসার উৎস নিয়ে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বঙ্গদেশে ও বঙ্গ সন্নিহিত এই প্রদেশে যৌথ অনার্য সভ্যতার প্রভাব তৎকালীন ক্ষীণশক্তি আর্য সভ্যতার প্রভাবের থেকে কিছু কম ছিল না। ফলে ধর্মীয় মিশ্রণের স্রোত উভয় মুখেই প্রবাহিত হয়েছে। কোনও কোনও আর্য দেবদেবী যেমন অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে আদিবাসী ধ্যানধারণার সমীপবর্তী হয়েছেন, তেমনি কিছু কিছু অনার্য দেবদেবীও অল্পাধিক রূপান্তরিত হয়ে সাদরে গৃহীত হয়েছেন আর্য সমাজে। অনার্য ধর্মজগৎ থেকে যে

আর্য-তাড়িত দ্রাবিড়গণ যখন পূর্ব ভারতে বসবাস শুরু করে, তার পূর্বেই তাদের মধ্যে সর্পদেবীর পূজা প্রচলিত হয়ে গিয়ে থাকবে। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রবেশপথগুলি দিয়ে অতীতে যেসব মোঙ্গল জাতির আগমন হয়েছিল, তাদের প্রচারিত আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র পরবর্তীকালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। পূর্ব ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'জাঙ্গুলী' নামে এক স্ত্রী দেবতার পূজা ব্যাপক প্রচলিত ছিল।

দেবদেবীরা আর্য ধর্মজগতে সগৌরবে প্রবেশ লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে মনসাই প্রধান।'

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী মনসা জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মা এবং বাসুকির বোন। ব্রহ্মার উপদেশে কাশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবনে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে উৎপাদন করেন, সেই জন্য ইনি মনসা এবং এঁকে কাশ্যপের মানসী কন্যা বলা হয়। সর্পভয়ে ভীতদের জন্য ব্রহ্মার উপদেশে কাশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করেন এবং এর অধিষ্ঠাত্রী রূপে মনসার সৃষ্টি করেন। মহাদেবের কাছে মনসা স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদির শিক্ষা নিয়ে সিদ্ধা হন। দেবতা, মনুমুনি নাগ, মানুষ সকলেরই পূজিত হন মনসাদেবী। কাশ্যপ মনসাকে জরুৎকারু মুনির সঙ্গে বিয়ে দেন। এঁদেরই পুত্র আস্তিক।

আর্য-তাড়িত দ্রাবিড়গণ যখন পূর্ব ভারতে বসবাস শুরু করে, তার পূর্বেই তাদের মধ্যে সর্পদেবীর পূজা প্রচলিত হয়ে গিয়ে থাকবে। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রবেশপথগুলি দিয়ে অতীতে যেসব মোঙ্গল জাতির আগমন হয়েছিল, তাদের প্রচারিত আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র পরবর্তীকালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। পূর্ব ভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'জাঙ্গুলী' নামে এক স্ত্রী দেবতার পূজা ব্যাপক প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতদের মতে, এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলির সঙ্গে বাংলার সর্পদেবী মনসার সাদৃশ্য আছে। পাল রাজাগণ যেহেতু মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সে জন্য এরকম অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, জাঙ্গুলীদেবীর প্রভাব বাংলাদেশ, বিশেষত উত্তরবঙ্গ আসামে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক অবধি ব্যাপক ছিল।' এই প্রসঙ্গেই আমরা মনসা পূজার মন্ত্র উল্লেখ করতে পারি— 'চার্বঙ্গীং দধতীং প্রমাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং সুদা/ বন্দে শঙ্কর পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদভবাং জাঙ্গুলীম্।' উত্তরবঙ্গে সর্পদেবী মনসার পরিচিতি বিষহরী হিসেবে, যিনি বিষহরণ করেন। মনসার নাম উৎপত্তি নিয়ে নানা মত রয়েছে। বোড়োদের মধ্যে সুহ্নীবৃক্ষ অর্থাৎ সীজমনসার গাছে সাপের দেবীর পূজার প্রচলন আছে, এর থেকেও 'মনসা' শব্দটি আসতে পারে বলে মনে করেন গিরিজাবাবুরা। মাইনাও ধর্মাবলম্বীদের এই পূজার সঙ্গে মনসার সম্পর্ক রয়েছে মনে হয়। এদের খেরাই পূজার সঙ্গে বিষহরীর সাদৃশ্য থাকলেও সীজ বৃক্ষ পূজার সঙ্গে সম্ভবত সম্পর্ক রয়েছে শিবের। সর্পদেবীর পূজার উল্লেখ সান্ডার্স তাঁর রিপোর্টেও করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস উদ্ধৃত করে, এঁর কৃপা হলে মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় ও সামগ্রিক উন্নতি হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। দেবী কুপিত হলে মৃত্যুসহ নানাবিধ দুর্ভোগেরও কথা লিখেছেন। যা-ই হোক, দুই রকমের বিষহরী পূজার প্রচলন রয়েছে উত্তরবঙ্গে— কানি বিষহরী ও গীদালী বিষহরী। গীদালী বিষহরীর সঙ্গে গানের সম্পর্ক নিবিড়। বিষহরীকে প্রজনন প্রতীক রূপেও দেখা হয়। বিবাহকালীন সময়ে এঁর আরাধনার আয়োজনের সঙ্গে এই সম্পর্ক যুক্ত। বিষহরী বা মনসাকে নিয়ে হিমালয় সন্নিহিত বাংলার

অনেক জায়গাতেই অতি প্রাচীনকাল থেকে বড় আকারে পূজা ও মেলার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির মনসা পূজা। রাজপরিবার সূত্রে জানা যায় যে, রায়কত বংশের প্রতিষ্ঠাতা শিশুসিংহ (১৫১৫)-র সময় থেকেই এই রাজবাড়িতে মনসা পূজার প্রচলন। একসময় রাজবাড়িতে যে দু'টি পূজা ব্যাপক উৎসবের আকারে পালিত হত, তার অন্যতম এই মনসা পূজার জাঁকজমক ও আড়ম্বর ছিল দেখার মতো। শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। মাসখানেক আগেই রাজ-অধীন এলাকার বিভিন্ন মহাল থেকে পূজার উপকরণ আনা শুরু হত। পাতকাটা ও মণ্ডলঘাটসহ মহালগুলো এক-একটি

উপাচারের দায়িত্বে থাকত। পূজায় হাজির হতেন প্রচুর মানুষ। এঁদের জন্য প্রসাদ থাকত দই-চিঁড়ে। বাংলার ১২৮৮-তে পাঠানো প্রজাদের পুজোর উপকরণ— ছাগপাঁঠা ১টা, কবুতর ৪ জোড়া, হংস ৪ জোড়া, মনুয়াকলা ২ পিড (কাঁদি), দক্ষিণী কলা ১৫ পির, পানি কুমড়া ১০টা, মিঠা কুমড়া ১০টা, হংসের ডিম ১০টা, কচু ২ ভারা, পেঁয়াজ ২ কাঠা, রশুন ২ কাঠা, মরিচ ২ কাঠা, আদ্রক ২ কাঠা ইত্যাদি। পূজার তিন দিনই বলির আয়োজন হত। কলার ভেলায় করে রাজবাড়ির পুকুরের মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হত। আগে রাজবাড়ির নাটমন্দির সংলগ্ন জায়গায় মূর্তিগড়ে পুজো হত, আজ জায়গা পালটেছে। জৌলুস পালটালেও স্মৃতির টানে মানুষ আসত আজও কাতারে কাতারে। মূর্তিকার এখানেই মূর্তি গড়েন। জরৎকারু মুনির ডান দিকে বিরাজিত পিঙ্গলবর্ণা পদ্মামূর্তি। বাঁ দিকে বসে গৌরবর্ণা নেতা। দু'জনেরই বাহন হংস। নেতা এখানে পূজিত হন বড় মনসা রূপে। ছোট মনসা পদ্মা। আজও পুরনো প্রথা অনুযায়ী সংকল্পিত ব্যক্তিকে পূজা শুরুর আগে পা ধুইয়ে বরণ করে দেন দেউড়ি। প্রথম দিন বলি ও পূজা এবং শেষ দিন বিষহরীর গান। মনসামঙ্গলের গান হয়। রাজ-আমল থেকে এই পূজা উপলক্ষে স্কুল-কলেজ ছুটি দেওয়ার প্রথা চালু আছে আজও। রাজবাড়ি ছাড়াও খারিজা বেরুবাড়িতে মনসা পূজা উপলক্ষে প্রায় দুই দশক হল মেলা বসছে। বেরুবাড়ি, মণ্ডলঘাট থেকে শহর সংলগ্ন পান্ডাপাড়া, খড়িয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে মানুষজন এই মেলায় হাজির হন। মেলায় যাত্রাগান ছাড়াও নানারকম দোকান ও বিনোদনের উপকরণ থাকে। এই মেলা চৈত্র মাসে মনসা পূজা উপলক্ষে হয়। এ ছাড়া রাজগঞ্জের সুখানিতে বিষহরী পূজা উপলক্ষে মেলা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে সর্বজনীন উদ্যোগে এই বিষহরী পূজার আয়োজন করা হয়। মূর্তি নির্মাণ করে বিপুল আয়োজনে পূজা হয় এবং সেই সঙ্গে মেলাও বসে। ধূপগুড়ির পূর্ব মল্লিকপাড়াতেও শ্রাবণ মাসে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩৫ বছরের প্রাচীন এই মেলায় ক্রমশ জনসমাগম বাড়ছে। তিন দিন ধরে চলে এই মেলা। সাকোয়াঝোরা, গাদং, মাগুরমারি প্রভৃতি গ্রাম থেকে মানুষজন আসেন এই মেলায়। এখানে বিপণন বাণিজ্যের পসরা নিয়ে আসেন ধূপগুড়ি, বীরাপাড়া, গয়েরকাটার ব্যাপারীরা। মেলা উপলক্ষে বিষহরির গানের আয়োজন করা হয়।

দুর্গা-জগদ্ধাত্রী-বাসন্তী পুজো

মনসা পূজার মতোই জলপাইগুড়ি রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে মানুষজন আর যে পূজার ব্যাপক আয়োজনে মেতে ওঠে তা হল দুর্গা পূজা। জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে দুর্গা পূজার প্রচলন কবে থেকে তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এর সূচনাপর্ব নিয়ে একটি মিথ রয়েছে। হাজোর দুই মেয়ে হীরা ও জিরার চার পুত্র তার সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলের ধারে খেলতে খেলতেএক দেবীমূর্তি কুড়িয়ে পায়। তাকে পূজা করে তারা। সে সময় তাদেরই এক সঙ্গীকে বলিপ্রদত্ত করা হয়। এই ভগবতীদেবীই বর্তমানের রাজবাড়ির দুর্গার প্রাচীন রূপ। উল্লেখ্য, হাজোর দুই মেয়ে হীরা ও জিরার চার পুত্র মদন, চন্দন এবং বিশ্বসিংহ ও শিশুসিংহ। বিশ্বসিংহ কোচবিহারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শিশুসিংহ থেকে জলপাইগুড়ির রায়কত বংশের সূচনা। এই দুই রাজবাড়ির আরাধ্য দেবীমূর্তিরও তাই সাদৃশ্য রয়েছে। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবীমূর্তি। ব্যাঘ্রাসীনও ছিলেন অতীতে। এখন সিংহও রয়েছে, বাঘও রয়েছে, দু'পাশে রয়েছে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। নরবলি তো নয়ই, এখানে আজ বলিপ্রথাও উঠে গিয়েছে। তবে দুর্গা পূজার সময় এই পূজার অন্য বিশেষত্বগুলো বজায় রেখে পূজার আয়োজন করা হয়। এখনও মূর্তিকার আসাম থেকে আসেন বংশপরম্পরায়। মেলা উপলক্ষে আগে রাজ-উদ্যোগে যে ব্যাপক আয়োজন হত, আজ আর তা হয় না।

দুর্গা পূজা উপলক্ষে গোটা বাংলাই উৎসবে মেতে ওঠে। তবে এই উৎসবে অন্য মাত্রা জুড়ে দেয় গ্রামবাংলার বেশ কিছু পূজা ও উৎসব। এমনই একটি জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠের রংধামালীর দুর্গা পূজার উৎসব। গ্রামীণ এলাকায় চার দিন ধরে বসে এই উৎসব উপলক্ষে মেলা। এই মেলাকে ঘিরে মেতে ওঠে আশপাশের গ্রাম, সংলগ্ন দু'-তিনটে চা-বাগানের শ্রমিকরা। মেলায় পারস্পরিক দোকানপাটের পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ এর লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান। যাত্রা, পালাগান, দেবীমাহাত্ম্য গান প্রভৃতি। এমনই একটি মেলা বসে শহরের দক্ষিণের প্রান্ত ছাড়িয়ে গড়ালবাড়ি মৌজার ধাপগঞ্জেও। আশ্বিন মাসের দুর্গা পূজার সময় একদিনের এই মেলা সত্তর/আশি বছরের প্রাচীন। এমনই আর একটি মেলা হয় এই সময় বেরুবাড়ির হাটখোলায়। এই মেলাটির বয়স প্রায় তিনশো বছর উল্লিখিত আছে। দেশভাগের আগে মেলাটির ব্যাপকতা ছিল আরও। ধূপগুড়ির পূর্ব মল্লিকপাড়াতেও একদিনের জন্য এ সময় মেলা বসে। বিজয়াদশমীর দিন। দুর্গা পূজায় ধূপগুড়ির আর যে মেলাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে তা হল গেন্দ্রাপাড়ার দুর্গা পূজার মেলা। অষ্টমীতে এই মেলা বসে। ১৩৫৮ সাল থেকে মেলাটি বসছে। বানারহাট, মরাঘাট, কলাবাড়ি, মোগলকাটা প্রভৃতি চা-বাগানের

শ্রমিকরা এই মেলায় অংশ নেন। যাত্রাগান থেকে নাগরদোলা— সবকিছুর আয়োজন থাকে এই মেলায়। এমনই আর-একটি মেলা হয় বীরপাড়া চা-বাগানে, প্রায় চল্লিশ বছরের প্রাচীন এই মেলা। ফালাকাটাতে দশমীর দিন দুর্গা পূজার দিন মেলা বসে। মুজনাই নদীতে বিসর্জন উপলক্ষে হয় এই মেলা। নিছক ভাসানের মেলা নয়, নানা রকমের দোকানপাট, বিনোদন ও খেলাধুলোর আয়োজনে এটি এই অঞ্চলের প্রধানতম মেলা হয়ে ওঠে। ফালাকাটার দুর্গা পূজার মেলায় অতীতে ভুটিয়া ব্যাপারীদের আগমন ঘটত। এখানে ভোট ঠাকুরের পূজা হয় বড় বাড়িতে। আলিপুরদুয়ারের টটপাড়াতেও দুর্গা পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। ৬০/৬৫ বছরের পুরনো এই মেলায় আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ও বন্দরের মানুষ আসেন। এমনই দুর্গা পূজার মেলা হয় সোনারপুরের হাটখোলায়। সব জায়গাতেই ব্যাপারীরা আলিপুরদুয়ার শহর ছাড়াও কোচবিহার সংলগ্ন অঞ্চল থেকে আসেন। মেলা কমিটি পালাগান প্রভৃতির আয়োজন করে। মেলার দোকানের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার ও মনিহারি দোকানই বেশি। বানারহাটেও দুর্গা পূজার সময় বড় আকারের মেলার আয়োজন করা হয়। আয়োজন হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সাম্প্রতিককালে এই দুর্গা পূজার মেলাটির জৌলুস অনেক বাড়ছে। দুর্গা পূজার থেকে লক্ষ্মী পূজা পর্যন্ত চলে এই উৎসব। ধীরে ধীরে ওই এলাকায় প্রধান মেলার চেহারা নিয়েছে।

দুর্গা পূজা নিরঞ্জন উপলক্ষে দশমীর ঘাটকে ঘিরে জলপাইগুড়িতে বেশ কয়েকটি জায়গায় মেলা বসে। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য করলা নদীর ধারে সমাজপাড়ার ঘাটের মেলা। স্বাধীনোত্তর সময় থেকে এই মেলা বসছে। প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলায় জনসাধারণের ভিড় হয় প্রচণ্ড। এই ভিড়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অসামরিক প্রতিরক্ষাবাহিনীর পাশাপাশি জেলা পুলিশও বিরাট ভূমিকা নেয়। এই প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ১৯৪০-এ এই শহরের স্বাধীনতাকামী যুবকরা এই উৎসবের জনসম্মিলনকে কাজে লাগিয়েই ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার শুরু করেন। বীরেন দত্তর মতো যুবকরা সে দিন নিরঞ্জন ঘাটে নৌকা করে বিভিন্ন পোস্টার ঝুলিয়ে নৌ-শোভাযাত্রা করেছিলেন, তাতে লেখা ছিল ইংরেজ শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে সেই যুবকরা আক্রান্ত হলেও বিদ্রোহের বীজ রোপিত হয়েছিল শহরের বুকে। আজও শহরের মানুষ ভিড় করে যেন ভেঙে পড়েন এই দিন নদীর ধারে। সম্প্রতি কিং সাহেবের ঘাটে করলার ধারে ‘বাবুঘাট’-এ দশাননের পুতুল পোড়ানোর আয়োজন হচ্ছে উত্তর ভারতের দশেরার অনুকরণে। করলা নদী ছাড়াও দেশবন্ধু নগরের দিঘিতে ও মাষকলাইবাড়ির ঘাটে এই উপলক্ষে মেলা বসছে, যা দিন দিন আকারে বাড়ছে। ময়নাগুড়ির পানবাড়ির বড় বাড়ির মেলাও অনেক প্রাচীন। এমনই ময়নাগুড়ির জটদা নদীর ধারে ফুটবল মাঠের দশমীর ঘাটকে ঘিরে একটি মেলা হয়, এটিও অর্ধশতক পার হয়ে আসছে।

দুর্গা পূজার মতোই জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষেও মেলা বসে। এই মেলা তিন দিন ধরে হয়। জলপাইগুড়ি শহরেও যোগমায়া কালীবাড়ির সামনে বাসন্তী পূজার মেলা বসে। সম্প্রতি বোসপাড়ার কান্তেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন স্থানে এই পূজার মেলা বসছে। ক্রমশ বাড়ছে এর জাঁকজমক। যোগমায়া কালীবাড়ির পাশের জমিতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা হয়।

জেলার প্রায় সর্বত্রই আজ দুর্গা পূজার বারোয়ারি আয়োজন হচ্ছে। মেলা হচ্ছে অনেক জায়গাতে এই উপলক্ষে। সাম্প্রতিক সময়ের এমনই এক উল্লেখযোগ্য দুর্গা পূজা রাজগঞ্জ ব্লকের বলরাম গছের পূজা। দুই গ্রাম— বলরাম ও ভাণ্ডারী গছের মানুষের এই বারোয়ারি পূজার বিশেষত্ব এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চরিত্র। হিন্দু দেবীর পূজা হলেও এর আয়োজকদের সিংহভাগ স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। এই পূজাকে ঘিরে মেলা বসে, আয়োজন হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

দুর্গা পূজার মতোই জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষেও মেলা বসে। এই মেলা তিন দিন ধরে হয়। জলপাইগুড়ি শহরেও যোগমায়া কালীবাড়ির সামনে বাসন্তী পূজার মেলা বসে। সম্প্রতি বোসপাড়ার কান্তেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন স্থানে এই পূজার মেলা বসছে। ক্রমশ বাড়ছে এর জাঁকজমক। যোগমায়া কালীবাড়ির পাশের জমিতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা হয়। এই উপলক্ষে কালীবাড়িতে মেলা বসে তিন দিন ধরে।

কুমারগ্রাম থানার চেংমারি গ্রামে হয় সর্বজনীন বাসন্তী পূজা। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই পূজা হয়ে আসছে, পূজা উপলক্ষে মেলাও বসছে। এখানে বাসন্তী মন্দিরও আছে।

চড়ক

গ্রামীণ মানুষের কাছে চড়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব এবং চড়কের মেলা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে হাজির হয়। চৈত্রসংক্রান্তির দিনকে মহাবিষুব বা বিষুবসংক্রান্তি বলা হয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পার্বণের সময় বা উৎসবকাল। এই উৎসবের অঙ্গ গমীরা ঠাকুরের পূজা, ভক্তিয়ার খেলা এবং চড়ক। চৈত্রসংক্রান্তির কয়েক দিন আগেই গমীরা ঠাকুরের পূজামণ্ডপ তৈরি করা হয়। গমীরা ঠাকুরের পূজা স্থাপনের পরদিন থেকে শেষ পূজার আগের দিন পর্যন্ত ভক্তগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করে ও নানারকম কসরত দেখিয়ে চাল ও অর্থ সংগ্রহ করে। এদের মধ্যে শিব-গৌরী সেজে নাচ-গান করা ছাড়াও ভক্তিয়ার গান গাওয়াও হয়। এ সময় গৌরীপাট স্থাপন করা হয়। বিষুবসংক্রান্তির আগের দিন শলা বা ঘট স্থাপন করা হয়। এর পর বিভিন্ন পর্যায়ে এই পূজা এগতে থাকে। শ্মশান খেলা, ভক্তিয়ার খেলা ও গান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এই পর্ব শেষ হলে চৈত্রসংক্রান্তির দিন হয় চড়ক। এই দিন আশপাশের সমস্ত গ্রামের মানুষ পূজাস্থানে সমবেত হন। মেলা বসে যায় চড়ক ঘিরে। চড়ক খেলায় একটি সজীব শিমুল গাছ কেটে পুজো করে বসানো হয়। পায়রা উড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি গাছটিতে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয় ও আম্রপল্লব লাল গামছা বা লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। গাছের মাথার দিকে আড়াআড়িভাবে একটি বাঁশ বাঁধা থাকে। বাঁশটির একটি প্রান্তে দড়ি লাগিয়ে গাছের গোড়ায় আটকানো থাকে। অন্য প্রান্তে একটি বড় বড়শি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যাঁকে চড়কে ঘোরানো হবে, তাঁর পিঠে ওই বড়শি ফুটিয়ে দেওয়া হয়। চড়কে ঘোরবার আগে তিনি একটি জীবন্ত পায়রার মাথা ছিঁড়ে রক্তপান করবেন। পিঠে বড়শি-বেঁধা অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে তিনি সমাগত দর্শকদের থেকে পয়সা তুলবেন, প্রসাদ ছুড়বেন। এভাবে সাতবার ঘুরে তিনি নেমে আসবেন। এ সময় শরীরের অন্যান্য জায়গাতেও বাণফোঁড়ের ব্যবস্থা করেন এঁরা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই পূজার সমাপ্তি ঘটে। এই চড়ক বা গমীরা ঠাকুরকে কেউ কেউ শিব উপাসনার রূপ বলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ‘উত্তরবাংলার লোকসংস্কৃতির উপকরণ সাধারণতঃ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। লৌকিক শৈব ধর্মের

ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং গমীরা শব্দটিই ক্রমে সংস্কৃতের প্রভাবের বশবর্তী হইয়া গম্ভীরায় (মাহদহ-র) পরিণত হইয়া থাকিবে।' ডঃ গিরিজার এ প্রসঙ্গে অভিমত হল, 'গমীরা ঠাকুর প্রকৃত প্রস্তাবে শিব ঠাকুর, কেননা পূজার সময় যে মাটির মূর্তিটি তৈয়ারি করা হয় তাহা শিবেরই মূর্তি। মহাস্নানে ত্রিশূলের ব্যবহার, উপাচার হিসেবে গাঁজা ধুতুরা ভাঙের প্রয়োগ, ভক্তিয়ার গানে শিব-দুর্গার সজ্জা গ্রহণ প্রভৃতি প্রমাণও শিবের অনুকূলে। 'বাংলা কাব্যে শিব' অনুযায়ী গাজনের প্রধানতম অঙ্গ চড়কপূজা। আকাশপথে সূর্যের বৃত্তাকার ভ্রমণের অনুকরণে চড়ক ঘোরে। একদা সূর্যসাযুজ্য লাভের বাসনায় আদিম মানুষ ঘুরত চড়কে, আজ শিবের নামোচ্চারণ করে তাঁর প্রতি কামনায় ভক্তরা চড়কে ওঠে।' তবে আশুতোষ ভট্টাচার্যর অভিমত একটু ভিন্ন। তাঁর মতে, এটি আগাগোড়া সূর্যোৎসব, এর সঙ্গে পৌরাণিক শিবের চরিত্র কিংবা শিব পূজার কোনও সম্পর্ক নেই। যে দিন চড়ক পূজা হয়, অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিন, সে দিন সূর্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 'অয়ন' বা 'যাত্রা' শুরু হয়— সূর্য দ্বাদশ রাশির পথে পরিক্রমা শেষ করে আবার পূর্বপথে নতুন যাত্রার জন্য নতুন রাশিতে প্রবেশ করে। চড়ক (অর্থাৎ চক্রপথে আবর্তন) সেই মুহূর্তে সূর্যের দ্বাদশ রাশির চক্রপথে আবর্তনের সূচনার প্রতীক। যেখানে চড়ক হয়, সেখানেই মেলা বসে। জলপাইগুড়ি শহরের কাছে অরবিন্দনগরের মাঠে চড়ক মেলা বসছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এ ছাড়াও সম্প্রতি সংক্রান্তির কয়েকদিন পরে চড়কের মেলা বসছে নেতাজিপাড়াতেও। এমনই চড়কের বেশ বড় মেলা ধূপগুড়ির উত্তর মাগুরমারি গ্রামে, প্রায় ৫০ বছর ধরে এই মেলা বসছে। শহরের উপকণ্ঠে বানিয়াপাড়াতেও অনেক প্রাচীনকাল থেকে চড়কের মেলা বসছে। বেরুবাড়ি হাট ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ ছাড়াও ধাপগঞ্জ, শোভাবাড়ি প্রভৃতি গ্রামের মানুষ এই মেলায় অংশ নেন। ময়নাগুড়ির কয়েকটি গ্রামেও চড়কের মেলা হয়ে আসছে অনেকদিন আগে থেকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝাড় বড়গিলার চড়কের মেলা। দু'-তিন দিন ধরে মেলা হয় এবং সংক্রান্তির দিন ময়নাগুড়ির উত্তর-পূর্ব দিকের যাবতীয় গ্রামের মানুষ এখানে ভিড় করেন, প্রধানত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের মেলা এটি। পালাগান প্রভৃতির আয়োজনও হয় এখানে। আমগুড়ির কাছে বকশির ডাঙা গ্রামেও এমনি চড়কের মেলা বসে। আলিপুরদুয়ারের কলাবড়িয়া গ্রামেও চড়কের মেলা বসার উল্লেখ রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের কলাবড়িয়া গ্রামেও চড়কের মেলা বসার উল্লেখ রয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লকের পয়াচারির বানিয়াপাড়ায় অনেকদিন ধরে চড়কের মেলা হচ্ছে। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ এই মেলা। মেলায় মনিহারি দোকান ও খাওয়াদাওয়ার দোকান ছাড়াও গানবাজনার আয়োজন থাকে। মেলাটি প্রায় ৭৫ বছরের পুরনো। বস্তুত গোটা উত্তরবাংলা জুড়েই চড়কের ছোট ছোট মেলা বসে। যেখানেই চড়কের আয়োজন হয়, সেখানেই তা ঘিরে মেলা বসে। চড়কের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বৈশাখী সংক্রান্তিতে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন কালজানি নদীর সেতুর নিচে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের চড়ক মেলা। দীর্ঘ দিনের এই মেলায় সমস্ত গ্রাম ও শহর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

শিব-দুর্গা থেকে ভাণ্ডানী বা চড়কের

পূর্বতম প্রান্তের কামাখ্যাগুড়ির কামাখ্যাদেবীর পূজা ও সেই উপলক্ষে আয়োজিত মেলাকে ঘিরেও ব্যাপক জনসমাগম হয়। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচি তিথিতে এই পূজা ও উৎসব হয়। এটি জেলার প্রাচীনতম উৎসবের অন্যতম। এর পিছনে একটি লোককাহিনি রয়েছে। কামাখ্যাগুড়ি ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলো ছিল অরণ্যসংকুল। বন্য জন্তুজানোয়ারের অবাধ বিচরণক্ষেত্র।

মতো গোটা অঞ্চল জুড়ে না হলেও বেশ কিছু মেলা বা উৎসব বিশেষ কোনও মন্দির, থান বা স্থানকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে এমন বিশেষ কিছু মেলা রয়েছে, যা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এমনই একটি মেলা বসে ময়নাগুড়ির সদরখৈয়ে। ব্যাঙ্কান্দি গ্রামের সদরখৈয়ে প্রতি বৈশাখ মাসে এই পূজা ও উৎসব আয়োজিত হয়। ৬০/৬৫ বছরের প্রাচীন এই মেলাতে যদিও তার অতীত জৌলুস আর নেই। তবুও আজও মেলাটি টিকে আছে। সদরখৈয়ে একটি অতি প্রাচীন মন্দির ও সংলগ্ন নতুন মন্দির ঘিরে এই উৎসব। মন্দিরটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বও অপরিসীম। মন্দিরের ভিতর একটি কূপ রয়েছে। মন্দিরের ভগ্ন শিলাখণ্ডের কারুকাজ মনোগ্রাহী। কাছেই একটি বড় বাঁধানো পাথরের প্রাচীন জলাধার আছে। বৈশাখ মাসে এখানে মেলা ও পূজা হয়।

জেলার অন্য প্রান্ত আলিপুরদুয়ারের চিকলিগুড়ি গ্রামের বুড়া ঠাকুরের পূজাও উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় রাজবংশী ও রাভা, মেচ সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা অতীতকাল থেকে এই পূজা করে আসছে। এটি শিবেরই লৌকিক বা ভিন্ন রূপ বলে মনে করা হয়। এর সঙ্গে বাঘশূর ও কালশূর-এর পূজা হয়। হাতির উপর আসীন এই বুড়া ঠাকুরের পোশাক রাজকীয়— ব্যাঘ্রাসনে অধিষ্ঠিত বাঘশূরের যোদ্ধার বেশ এবং তা পীতবর্ণ। পূজার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ নেই এবং পূজারিও উল্লিখিত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই ঠিক করা হয়। বলিপ্রথায় পাঁঠা উৎসর্গিত হয়। হাঁস, পায়রা, মুরগিকে গলা মুচড়ে বলি দেওয়া হয়। পুজো উপলক্ষে এই স্থানে মেলা বসে। তবে মেলার চরিত্র উত্তরবঙ্গের অন্যান্য গ্রামীণ মেলার মতোই।

কামাক্ষা-শীতলা ও অন্যান্য

পূর্বতম প্রান্তের কামাখ্যাগুড়ির কামাখ্যাদেবীর পূজা ও সেই উপলক্ষে আয়োজিত মেলাকে ঘিরেও ব্যাপক জনসমাগম হয়। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচি তিথিতে এই পূজা ও উৎসব হয়। এটি জেলার প্রাচীনতম উৎসবের অন্যতম। এর পিছনে একটি লোককাহিনি রয়েছে। কামাখ্যাগুড়ি ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলো ছিল অরণ্যসংকুল। বন্য জন্তুজানোয়ারের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। একদিন কোচবিহারের মহারাজ শিকারে আসেন এই জঙ্গলে। তখন জঙ্গলবাসী মুষ্টিমেয়। জনবসতি ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। মধ্য কামাখ্যাগুড়িতে বহু দিনের পুরনো এক লোকদেবতার বিগ্রহ ছিল। কোচ রাজার হাতি একদিন ওই জঙ্গলের জলাভূমির কাদায় আটকে পড়ে। মাহুত অনেক চেষ্টা করেও হাতিটিকে তুলতে পারেনি। ক্রমশ হাতিটি

ওই পাঁকে ডুবে যেতে থাকে। দুশ্চিন্তায় রাজা সারারাত নিদ্রাহীন থাকলেন। পরদিন সকালে রাজার সঙ্গে এক কাঠুরিয়ার দেখা হয়। কাঠুরিয়া রাজার বিপদ দেখে এক ওঝাকে ডেকে আনে। সেই ওঝা রাজাকে জানায় যে, ওই স্থানীয় দেবী কামাখ্যা মায়ের পূজা দিতে হবে, তবেই হাতিটি উঠবে। রাজা কামাখ্যাদেবীর পূজা দেন এবং হাতিটি উঠে আসে। এই অলৌকিক ঘটনায় মুগ্ধ রাজা আদিবাসীদের দেবদেবতাকে শ্রদ্ধা জানান এবং প্রতিশ্রুতি দেন, ওই দিনটিতে (যা ছিল অম্বুবাচি তিথি) মধ্য কামাখ্যাগুড়ির আদি কামাখ্যাগুড়ি কামাখ্যাধামে কামাখ্যা মায়ের পূজা ও মেলার আয়োজন করবেন। এই থেকেই মেলার শুরু। কোচবিহারের রাজকোষ থেকে এই মেলা আয়োজনের ব্যয়ভার বহন করা হত। ইদানীং স্থানীয় মানুষরাই এই মেলার আয়োজন করছেন। এই ধামের পূজা যদিও আদিম প্রকরণ মেনেই হয়। কামাখ্যাদেবীর বাহন বাঘ। দেবীর চার হস্তে যথাক্রমে ত্রিশূল, চক্র, ধনু ও শর। উৎসবটি অম্বুবাচির সাত দিন আগে শুরু হয় এবং অম্বুবাচির ক'দিন চলে। মানত হিসেবে পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। বেচাকেনায় হাজির হন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ছাড়াও আশপাশের শহর-বন্দরের ব্যবসায়ীরা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষজন এই মেলায় অংশ নেন। কামাখ্যা ছাড়াও এই সময় পূজিত হন কালী, শিব, বিষ্ণু, গঙ্গা, মাশান, মুড়িয়া মাশান, পাগলি, যখা-যখিনি, বাকসুর, কালসুর, লোহাসুর, সত্যপির প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীও। অম্বুবাচির দিন আসামের প্রখ্যাত কামাখ্যাধামের মন্দিরেও উৎসব হয়। এর সঙ্গে নামে, চেহারায় এই দেবীর মিল এক অতীত সাযুজ্যর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। অম্বুবাচি আসলে শস্যোৎসব। আষাঢ়ের প্রারম্ভে অম্বুবাচি সাধারণত বিধবার প্রতিপাল্য ব্রত হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু মূলত এটি শস্যোৎসব। এ সময় পৃথিবী ঋতুমতী হন অর্থাৎ নববর্ষার সমাগমে পৃথিবীর শস্যোৎপাদন সম্ভাবনা জেগে ওঠে। তারই সূচনায় ভূকর্ষণ, বীজবপন প্রভৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তাই কৃষক এ সময় সমস্ত চাষ কাজ বন্ধ রাখেন। এভাবেই কোনও বিশেষ উৎসব বা পূজা সেই সম্প্রদায়ের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

কামাখ্যাগুড়িতেই আর-একটি মেলা হত, যা ইদানীং লুপ্তপ্রায়— রাজা দদানের মেলা। রাজা দদান সম্পর্কে রাভাদের মধ্যে একটি ইতিহাস কল্প প্রচলিত আছে। অতীতে রাজা দদান নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর পিতা হাহা, মাতা হুঁ হুঁ। স্ত্রীর নাম তৈবারানি। ডঃ ভুবনমোহন দাসের 'Ethenic Affinities of the Rabha' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রাজা দদান যুদ্ধ জয় ও রাজ্যলাভের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে রংজুলি নামক স্থানের পার্শ্ববর্তী ঝাটিয়াবাড়ি গ্রামে 'রায়খু' দেবতার মন্দির স্থাপন করেন। রায়খু দেবতার পূজা উপলক্ষে সেখানে বিরাট মেলা আয়োজিত হয়। কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত দলদলি ও চেংমারি অঞ্চলের হেমগুড়ি গ্রামে রাজা দদানের একটি বড় মন্দির ছিল। দদানের মাতা-পিতার নামে একটি পাহাড়ও ছিল। অতীতে এ অঞ্চলের বহু কোচ-রাভা পুণ্যার্থী প্রতি বৎসর বিভিন্ন তিথিতে তীর্থস্নান ও পূজা দিতে আসতেন। বৎসরে একবার বড় মেলা বসত। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে রায়ডাক (২ নং) নদীর প্রবল বন্যায় মন্দিরটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এখন ওই নদীর ধারেই মেলা বসলেও তা অতীতের গৌরব হারিয়েছে।

রাজগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এলাকায় ভদ্রেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি মেলা বসে। কালীনগর থেকে দক্ষিণে ৪/৫ কিলোমিটার দূরে। করতোয়া নদীর ধারে এই শিব মন্দিরটি আগে সীমান্তের ওপারে বর্তমানের বাংলাদেশের ভিতরে ছিল। দেশভাগের সময় বিগ্রহ তুলে নিয়ে এসে সীমান্তের এপাশে রাখা হয় এবং মন্দির তৈরি হয়। তবে এই মেলাকে ঘিরে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই উপস্থিতি থাকে উল্লেখযোগ্য। এই মেলাকে ঘিরে লোকগানের অনুষ্ঠানও হয়, তুক্ষাগানের আয়োজন করা হয়। শিবরাত্রি থেকে তিন দিন ধরে মেলা বা উৎসব হয় এখানে।

বানারহাটের শীতলা পূজাকে ঘিরে এক সপ্তাহের মেলা বসে। বানারহাট ও তার আশপাশের মানুষ এই মেলা উপলক্ষে মেতে ওঠেন। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে স্থায়ী শীতলা মন্দির ঘিরেই এই মেলা। পূজা উপলক্ষে চলে নামসংকীর্তন ও পদাবলি কীর্তন। মূলত এটি হিন্দু দেবীর পূজাকে ঘিরে হলেও উৎসবে শামিল হন সব ধর্মের মানুষই। নাটমন্দিরে চলে কীর্তনের আসর, পদাবলির ব্যাখ্যা। চলে মৃদঙ্গ, ঢোলক প্রভৃতি বাদন ও গানের আসর। মেলাটিতে বানারহাটের বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

উত্তরবাংলার রাজবংশী মানুষ অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে গ্রামদেবতার পূজা ও কোথাও কোথাও একে ঘিরে উৎসবের আয়োজনও লক্ষ করা যায়। প্রতিটি গ্রামেই গ্রামদেবতার স্থান থাকে, এর কোনও মূর্তি নেই, কোনও বিশেষ তিথি বা তারিখও নেই এই উৎসবের। বৎসরের একদিন গ্রামবাসীরা সুবিধামতো দিনে চাঁদা তুলে পূজা করেন। এ সময় গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য দেবদেবীরও পূজা হয়। সর্বজনীনভাবে গ্রামপূজার পাশাপাশি গৃহস্থের বাড়িতেও এই পূজা হয়। সর্বজনীন পূজার সময় গ্রামবাসী সমবেত হয়ে উৎসবে শামিল হন, এবং স্বভাবতই তা মেলার চেহারা ধারণ করে। এ ছাড়া গ্রামরক্ষীর পূজাও হয় কোথাও কোথাও। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাতকাটা গ্রামে ওই পূজার রীতি রয়েছে। গ্রামদেবতার মতোই একেও গ্রামের মঙ্গলের স্বার্থে আরাধনা করা হয়। ময়নাগুড়ির ঝাড় বড়গিলা বা মাটিয়ালির মঙ্গলবাড়ি প্রত্যেক জায়গাতেই গ্রামদেবতার থান রয়েছে, তবে মঙ্গলবাড়িতে এ নিয়ে উৎসব বেশ বড় আকারে হয়। বলিপ্রথাও রয়েছে এই উৎসবে। গ্রাম থানের এই পূজাকে ঘিরে আজ যেমন অনেক গ্রামেই উৎসব-মেলা বেশ জাঁকজমক নিয়ে জন্ম নিচ্ছে, তেমনি বেশ কিছু গ্রাম ঠাকুরের মেলা হারিয়ে যাচ্ছে বা গিয়েছে। যেমন রাজগঞ্জ ব্লকের ফাটাপুকুরের নিকটবর্তী নীরোদ সংঘ সংলগ্ন এলাকার গনহরের ধামে আগে মেলা হত, এটি গ্রামথান। আগে এখানে প্রায় এক মাস ধরে গান হত। এখন এই মেলা গ্রামথান থেকে সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী কালীবাড়ির কালী পূজার মেলায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

আমবাড়ি ফালাকাটাতেও গ্রামঠাকুরের মেলা হয়, স্থানীয় নাম জাতের মেলা। তিন দিন ধরে হয়। পায়রা, ছাগ প্রভৃতি বলিপ্রদত্ত হয়। এখানে বুড়াধেল্লা ও তিস্তাবুড়ির পুজোও হয়। রাজগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে লৌকিক গ্রাম ঠাকুরের পূজার আলাদা কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। এখানে সুখানিতে আষাঢ় মাসে ধান রোপণের আগে গারাম (গ্রাম) পূজা হয়। গোটা গ্রামের মানুষই এতে যোগ দেন। গ্রামথানে গারাম ছাড়াও ভদ্রকালী, থানকালী, সন্ন্যাসী বা মহাদেব, পির, মাদার প্রভৃতির পূজাও একসঙ্গে হয়। পূজার উপকরণ দই, চিঁড়ে, কলা ছাড়াও খিচুড়ি প্রসাদ হয়। মানত করা পাঁঠা বা পায়রা বলি দেওয়া হয়। 'দ্যামধা' বা পুরোহিত এই পূজা করেন। এই গ্রামে ধর্ম ঠাকুরের পূজাও হয়। বৈশাখ মাসে একটি হাঁসের ডিমকে ধর্ম ঠাকুর মনে করে তার পূজা করা হয়। এ ছাড়াও 'ধাম' পূজা উপলক্ষেও উৎসবের আয়োজন হয়। ফসল রোপণ ও কর্ষণের ফাঁকে বিনোদন উপলক্ষেই এই উৎসব হয়। পাটকাঠির একটা ঘর বানিয়ে গানের আয়োজন করা হয়। এই ধানগান-এর বিষয় নানারকম হয়ে থাকে। আমবাড়ি ফালাকাটায় পুলিশবাবা বলে এক পুলিশের পূজাও হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে পুলিশের পোশাকধারী এই মূর্তির আশ্বিন-কার্তিকে পূজা হয়, মেলাও বসে।

ধূপগুড়িরই সাকোয়াঝোরার ঝালটিয়ার হাটের মেলাও এক বিখ্যাত মেলা। স্থানীয় জোতদার ঝালটিয়া কার্জির নামানুসারে এই

উৎসবমাত্রেরই এক বহুজনীন পরিমণ্ডল থাকে, যা ধর্মসম্প্রদায়গত বেষ্টনীর মধ্যে উদ্ভূত হয়েও মিলনমুখী, আনন্দমুখী ও বর্ণাঢ্যতাময়। আসরাফ সিদ্দিকি এ প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন, ‘উৎসব প্রায়ই জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতিকে সম্ভাষণ, রাষ্ট্রবিজয়, নব্যধর্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বীরের প্রতি সম্মান বা অত্যাচারীর নিপাত উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশকে কেন্দ্র করে।

হাট ও মেলার নাম। ভাণ্ডানী পূজার সময় মেলা বসে। সে সময় চোর চুরনির পালা, গান এর অন্যতম আকর্ষণ। এ উপলক্ষে প্রচুর ভিড় হয়। এখানে ঝালটিয়া গ্রামথান আছে। শিবরাত্রিতে এখানে দু'দিন ধরে মেলা হয়। স্থানীয় লোকভাষায় পূজার মন্ত্র। দেউসি রাজবংশী তিলক রায়। এই মেলাও খুব প্রাচীন।

জলপাইগুড়ি শহর সন্নিহিত পাতকাটা গ্রামে গ্রামরক্ষীর পূজা হয়। তবে এই গ্রামের গোপাষ্টমীর পূজা ও উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্তিক মাসে তিন দিন ধরে এই মেলা হয়। শতবর্ষপ্রাচীন এই উৎসব ও মেলাটি আজকের দিনে কৌলীন্য হারিয়েছে। মদনমোহন জিউয়ের পূজা উপলক্ষেই এই মেলা। গোশালার এই মেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। ডুয়ার্স ও শিলিগুড়ি থেকে পুণ্যার্থীরা এই মেলায় আসেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভগবতপাঠ থেকে গান— সবকিছু নিয়ে মেলাটি জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাঙালি ছাড়াও মাড়োয়ারি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কাছেও মেলাটি গুরুত্বপূর্ণ। ফালাকাটার আর-এক উল্লেখযোগ্য পূজা ও মেলা হচ্ছে ফালাকাটা ও তুলাকাটা। স্বপ্নাদেশে মেলার তারিখ নির্ধারিত হয় বলে পূজারি জানিয়েছেন। সাধারণত আষাঢ় মাসে এই মেলা হয়।

পদ্মা থেকে তিস্তা, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া থেকে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বাঙালি সত্তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারের বিশেষ ভূমিকা। প্রাগার্য যুগের বাংলার আদিম লোকসমাজে ‘মানা’ (Mana), টোটেম (Totam) ও ট্যাবু (Taboo < Polynession-Tabu)-তে বিশ্বাস ছিল প্রবল। প্রতিটি ধর্মই কোনও না কোনওভাবেই জড়-জীবে অন্তর্লীন অতীন্দ্রিয় এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এই শক্তির সাহায্যেই মানুষ জীবনযুদ্ধে জয়ী হয় বলে মনে করে। অরণ্যজীবনে বিশেষ বস্তু বা প্রাণীর সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও নতিস্বীকার ‘টোটেমবাদ’-এরই মূল কথা। এবং টোটেম বিশ্বাসের ব্যত্যয় যাতে না ঘটে, তার জন্য নানা বিধিনিষেধ বা ‘ট্যাবু’ সৃষ্টি করেছে প্রাচীন লোকসমাজ। শুভাশুভ ধারণার মধ্যে ‘মানা-টোটেম-ট্যাবু’ নিষ্ণাত সংস্কারাদি কাজ করছে। এই প্রাগার্য চেতনার রেশ আমরা এই জেলার লোক উৎসবের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করি। প্রাক্-মুসলিম যুগ পর্যন্ত এই লোকবিশ্বাস ও আচার প্রাধান্য নিয়েছিল। মুসলিম যুগে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পিরবাদের প্রভাব। একেশ্বরবাদী ইসলামে আল্লাহ ও রসুল ব্যতিরেকে আচার-সংস্কারের কোনও স্থান নেই। অথচ এ দেশীয় অন্ত্যজ হিন্দু বা বৌদ্ধ জনগণ পিরের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর কবরে বাতিদান, চাদর চড়ানো, পিরের আধ্যাত্মিক শক্তির সহায়তালাভের ইচ্ছা প্রভৃতির মাধ্যমে। জলপাইগুড়ি শহর সন্নিহিত গোমস্তাপাড়ার পুরাতন মসজিদ সংলগ্ন কালু সাহেবের মাজার বা হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের দরগায় মানুষের উৎসবের পিছনে এই চেতনাই ক্রিয়াশীল। ‘পির’ ফরাসি শব্দ, অর্থ বয়স্ক ব্যক্তি, প্রচলিত অর্থে অধ্যাত্মসাধনার পরম গুরু। ইসলামে সুফি মতবাদ থেকেই পিরবাদের উদ্ভব। মুসলিম সিদ্ধপুরুষই সুফি, মুর্শিদ বা পির। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামে প্রতীক ও সাকারবাদ ঢুকেছে পিরবাদের সূত্র ধরে। আরব্য ইসলাম বাংলায় পৌঁছানোর পথে পারস্য, তুরস্ক, সমরকন্দ, বুখারা, আফগানিস্তান ও আর্যাবর্ত পাড়ি দেয়। বাংলার পথে ইসলামকে আত্মস্থ করতে হয়েছে নানা বৈচিত্রের সংস্কারকে, লোক ঐতিহ্যকে। এ প্রসঙ্গে ডঃ এনামুল হকের অভিমত, ‘বৌদ্ধ ধর্মত্যাগী নব্য মুসলিমদের মধ্যে যে হিন্দু বৌদ্ধ মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল, সুফিবাদের অভ্যন্তরে পীরবাবাদের উদ্ভিদমূলে তার ভূমিকা বিশেষ স্মরণযোগ্য। বৌদ্ধ থেরাবাদ ও চৈত্যপূজা কালক্রমে মুসলমান সমাজে পীরবাদ ও কবরপূজায় রূপ ধারণ করে। প্রাচীন যোগবাদ যেমন একসময় বিকৃত তন্ত্রের রূপ নেয়, প্রাচীন মরমী সুফিবাদ থেকেও বিকৃত পীরবাবাদের সূচনা হয়।’

উৎসবমাত্রেরই এক বহুজনীন পরিমণ্ডল থাকে, যা ধর্মসম্প্রদায়গত বেষ্টনীর মধ্যে উদ্ভূত হয়েও মিলনমুখী, আনন্দমুখী ও বর্ণাঢ্যতাময়। আসরাফ সিদ্দিকি এ প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন, ‘উৎসব প্রায়ই জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতিকে সম্ভাষণ, রাষ্ট্রবিজয়, নব্যধর্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বীরের প্রতি সম্মান বা অত্যাচারীর নিপাত উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেক দেশেরই উৎসব অনুষ্ঠানের একটা রূপক বা সিম্বলিক দিকও আছে।’ এই জন্যই এই তিস্তাবঙ্গকেই কোনও পৃথক উৎসব অঙ্গন বলে বিভাজিত করে ভিন্ন অভিধা দেওয়া যায় না। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও তাই ইসলামি উৎসব-অনুষ্ঠানও চান্দ্রমাস বা তিথি অনুযায়ী পালিত হয়। এখানেও পালিত হয় মহরম, ফতেহা-দোয়াজ-দাহম, শবে মেরাজ, শবে বরাত, রমজান (ইফতার), শবে কদর, ইদ (ইদ-উল-ফিতর, ইদুল-আযহা)। এ ছাড়াও অন্যান্য উৎসব, পির সংস্কৃতিকেন্দ্রিক উৎসবও রয়েছে। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখি উরস ও মেলার মধ্যে। পিরের জন্ম বা মৃত্যু তিথি উদ্‌যাপনই ‘উরস’ উৎসব। এ সময় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তসূরিদের আগমন, নজরানা (দর্শনী) দিয়ে পিরের জীবনী আলোচনা, মনোবাঞ্ছাপূরণের জন্য হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ধরনা দান, হাজত-মানত পূরণ, স্থানান্তে মানতকারীর প্রার্থনা, পিরপুকুরে শিরনি ভাসানো। একে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়। এগুলো অন্তরঙ্গে ধর্মীয় উৎসব হলেও বহিরঙ্গে মেলা। এই মেলাসূত্রেই সম্প্রদায়গত ধর্মীয় উৎসবও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, উৎসবমাত্রেই মিলন দ্যোতক, তাই সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন। এমনকি ধর্মীয় উৎসব ও মেলাগুলিও কালে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিবর্তিত ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত।

মসজিদ-দরবেশ ঘিরে মেলা

হিন্দু দেবদেবীকেন্দ্রিক মেলা ও উৎসবের পাশাপাশি মুসলিম বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মেলাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তবে মিশ্র সাংস্কৃতিক উদাহরণ এই জেলা। তাই মেলাগুলোর পিছনে ধর্মীয় অনুষজ্ঞ থাকলেও মেলাগুলো যতটা না ধর্মীয় চরিত্র নিয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি সৌভ্রাতৃত্ব ও নানা ধর্ম-বর্ণের সম্মিলনের চরিত্র নিয়ে বছর বছর টিকে আছে। এই কারণে হিন্দু দেবদেবীকে কেন্দ্র করে আয়োজিত মেলাও মুসলিম বা খ্রিস্টানদের কাছে সমান আগ্রহে ও অংশগ্রহণে যেমন জমে ওঠে, তেমনি মুসলিম বা দরবেশদের নাম ঘিরে আয়োজিত উৎসবে একইভাবে সমান আনন্দে শামিল হন হিন্দুরাও। এমনই এক সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর উদাহরণ জলপাইগুড়ি শহরের কালু সাহেবের মাজার ঘিরে অনুষ্ঠিত উৎসব। জলপাইগুড়ি শহরের পশ্চিম প্রান্তে চাউলহাটি তেঁতুলিয়া অভিমুখী সড়কের ধারে শহরের অন্যতম ধর্মপ্রাণ মুসলিম দীনু গোমস্তা ‘পুরাতন’

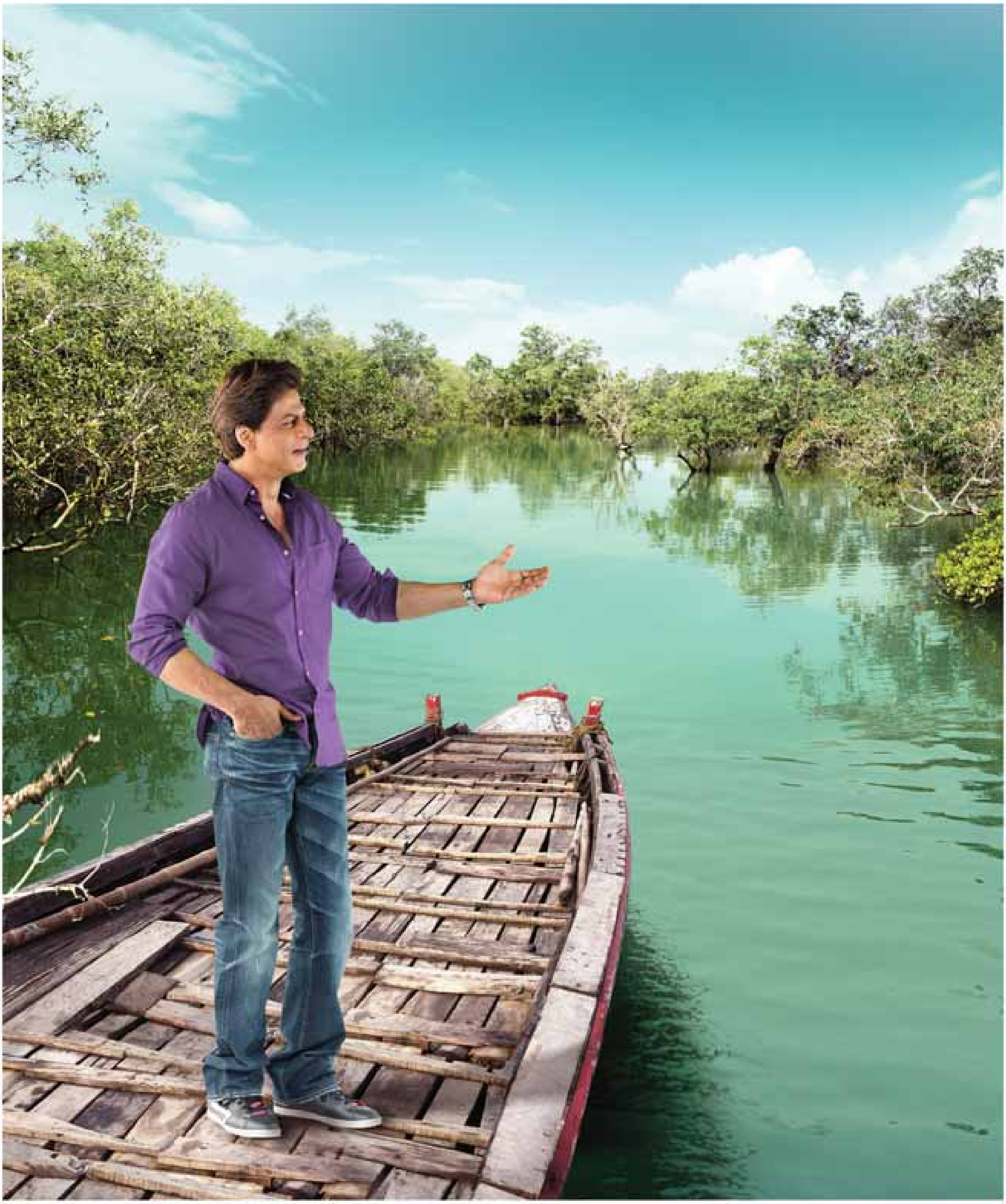

সুমধুর সুন্দরবন

প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য এখানে অনাবিল। ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে থাকা বাতাস, গা-ছমছমে ঘন অরণ্য আর নিজের খেয়ালে বয়ে চলা নিস্তরঙ্গ জলপথ - সব মিলিয়ে সুন্দরবন এখানকার চাকভাঙা মধুর মতোই মিষ্টি এবং মনোহর।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তাঁর জামাই মুন্সি সোনাউল্লা এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। মসজিদের পূর্ব দিকে একটি বড় দিঘি এবং দিঘির পূর্বে কালু সাহেবের মাজার। কালু সাহেবের মাজারও এক শ্রদ্ধার আসন নিয়েছে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ মানুষদের কাছে। প্রতি বছর ৫ চৈত্র এই মাজার ঘিরে বিশাল মেলা বসে। এই মেলায় জলপাইগুড়ি ছাড়াও রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ও শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকা ও ডুয়ার্স থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। মেলায় মূলত খাবারদাবারের দোকানই মুখ্য। এ ছাড়াও পূর্ব-দক্ষিণ গড়ালবাড়িতে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে 'ইছালে ছওয়াব' উৎসব হয়। নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত এক মাস আগে থেকে এর প্রস্তুতি শুরু হয়। ধর্মপ্রধানরা আসেন মুর্শিদাবাদসহ দূরদূরান্ত থেকে। ধর্মালোচনার আয়োজনের পাশাপাশি পিরের গান, তাজিয়া চান্দর প্রভৃতি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা থাকে। উৎসর্গিত মুরগি 'জবাই' করে রান্না করা হয়। দশদরগার লাঠি খেলার মেলাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে ১০/১২ কিমি দূরবর্তী স্থান দশদরগা। দশটি দরগা থেকে এর নাম দশদরগা। জায়গাটি রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত। এখানেই কিছুটা এগলে পানিকৌড়ি মগরাডাঙ্গির পয়াচারি স্কুলের মাঠে মহরমের সময় মেলা বসে। কোরফুল্লার মেলা বলে এটি পরিচিত। রমজান মাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মহরম উপলক্ষে জেলায় আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় মেলা বসে। এর মধ্যে সদর ব্লকের গড়ালবাড়ির কারবালা মাঠে আয়োজিত মহরমে প্রচুর ভিড় হয়। এ ছাড়াও চড়কডাঙ্গির স্কুল মাঠেও এ দিন লাঠি খেলার আয়োজন হয়। রাজগঞ্জ ব্লকেরই গাড়রার বেহারু হাটে এই এলাকার প্রধান মহরম অনুষ্ঠান হয়। মহরমের চল্লিশ দিন পরে অনুষ্ঠেয় চল্লিশা মহরম উপলক্ষেও অনেক জায়গায় লাঠি খেলা ও মুর্শিয়া গানের আয়োজন হয়। রাজগঞ্জের বলরামের চল্লিশা মহরম অনুষ্ঠান বেশ বড় আকারে হয়। ফুলবাড়ি মসজিদের সামনে অমাইদিঘিতেও মহরম মেলা হয়। একদিনের এইসব মেলার প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন দলের লাঠি খেলা ও প্রতিযোগিতা। এ ছাড়াও মুর্শিয়া গানেরও প্রতিযোগিতা হয়, যাতে বিভিন্ন গ্রামের দল অংশ নেয়।

মসজিদ প্রসঙ্গেই আসে আলিপুরদুয়ারের মজিদখানার কথা। ৩১ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন টটপাড়া (২ নং) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই মসজিদটি কেরামতি মসজিদ নামে বিখ্যাত। এখানে প্রতি চৈত্রে মেলা বসে। এই মজিদখানার মসজিদ ঘিরেও রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। পুরনো একটি ভাঙা মসজিদের উপর নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর উত্তরে রয়েছে একটি ভাঙা পুরাকীর্তিও। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খাটাজানি নদী। একসময় এই নদী ছিল খরস্রোতা, জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হত এটি, নদীপথে চলত ব্যবসাবাণিজ্য। টটপাড়া গ্রামে এই সময়ের নৌযান অবশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে। এই নদীর পাশেই সাউদপাড়া গ্রাম সওদাগর। মজিদখানার মসজিদ নিয়েও রয়েছে একটি লোকপ্রবাদ— 'চাঁদ কায়েত ভোলা কায়েত হুজুরের থানা/ বেটা নাই পুত্র নাই বানছে মজিদখানা।'

স্থানীয় লোকমুখে জানা যায়, চাঁদ কায়েত ও ভোলা কায়েত নামে দুই ভাই নদীপথে যাওয়ার সময় এখানে থামেন এবং ভাঙা মসজিদটি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন রাতারাতি। দুই ভাই মসজিদ সংলগ্ন পুকুরটিও খোঁড়েন। তবে এর ঐতিহাসিক সত্যতা প্রশ্নাতীত নয়। ১৮৬৪-তে ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হওয়ার পর তাদের সেনাপ্রধান কর্নেল হেদায়েত আলি খাঁ-কে এই মহকুমার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সময়ই এই স্থানে মুসলিম বসতি বৃদ্ধি পায়। চাঁদ ও ভোলা এ সময়ই হয়ত মসজিদটি সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যা-ই হোক, এখন এই মজিদখানা সর্বধর্মের মানুষের কাছেই পুণ্যস্থান। প্রতি শুক্রবার এখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে সুখশান্তির প্রার্থনা করেন নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রতি বছর চৈত্র মাসে এখানে বিরাট মেলা বসে। একদিন একরাত ধরে চলে এই মেলা। চলে মুর্শিয়া গান, লোকগানের অনুষ্ঠান। লক্ষাধিক মানুষ এই সম্প্রীতির মেলায় এসে মিশে যান। সম্ভবত ১৩৯২ বঙ্গাব্দ (১৯৮৬) থেকে প্রতি বছর ৫ চৈত্র এখানে মেলার আয়োজন হয়। সারারাত ধরে মেলা চলে। মেলায় প্রতিবেশী রাজ্যগুলো থেকেও নানা সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। ধর্মসভায় কোরানসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠও আলোচনা হয়। এ ছাড়াও হয় মুর্শিয়া গান ও লোকগানের অনুষ্ঠান।

গয়েরকাটার সোনাখালিতে নেপাতি ও সাইচকা নদীর সংগমস্থলে মহা ধুমধামে হয় বার্ষিক ওরশ মোবারক মেলা। সম্প্রীতির বড় নিদর্শন এই মেলা। উৎসব ইসলামধর্মীয় হলেও হিন্দুসহ অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও মেলা এটি। গয়েরকাটা, বীরপাড়া, ধূপগুড়ি ছাড়া ভুটান ও বক্সা পাহাড় থেকেও পুণ্যার্থীরা আসেন এই মেলায়। দরবেশ বাবার ওরশ মোবারক উপলক্ষে এ সময় মোমবাতি জ্বালানো হয়। জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে এই মেলা বসেছিল এবার। দরবেশ বাবাকে মানত করা মুরগি ও পাঁঠা এবং পায়রা নজরানা দেওয়া হয়। ২০/২৫ হাজার পুণ্যার্থীর জমায়েত হয় এই মেলায়।

দোল উৎসব

নানা ধরনের এইসব উৎসবের আলোচনায় আলাদা করে রাখা যায় দোল উৎসবকে। আবিরে রঙিন হয়ে ওঠার এই উৎসব গোটা জেলা জুড়েই হয়। এই উৎসবে রাধাকৃষ্ণ বা মদনমোহন থাকলেও মানুষের কাছে এ ছিল সর্বদাই এক ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব। এবং এর চলও ছিল অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। হোলি বা দোলের আর-এক নাম 'ফাগোয়া'। আসলে 'ফাগু' মানে পুষ্পরেণু। পুষ্পরেণু দিয়েই রাধাকৃষ্ণর মিলন খেলায় ফাগোয়া। দোলের অর্থ আবার দোলন। সূর্যর উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গমনাগমন মণ্ডলটিই দোলন। এই দোলন উদ্দেশ্যে সূর্যদেবের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণকে ঝুলন দোলনায় দোলানো হয়। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোপিকাদের সঙ্গে ঝুলন দোলনায় দুলতে দুলতে রং খেলায় মেতেছেন— এ দৃশ্য প্রাচীন চিত্রে লক্ষ করা যায়। হোলি নানা চেহারায় বিশ্বের অন্যত্র উৎসবের আঙিনায় রয়েছে। চিনে 'ফো স্বে ই চে', মায়ানমারে 'থ্বে', থাইল্যান্ডে 'সৌংকলম', পারস্যসহ আরও অনেক দেশেই এই উৎসব হয়।

জলপাইগুড়ি শহরের ৭/৮ কিলোমিটার দক্ষিণের ধাপগঞ্জে শ্রীকৃষ্ণর দোলযাত্রা উপলক্ষে দোলপূর্ণিমার দিন দোল উৎসব হয়ে আসছে। স্থানীয় রাজবংশী মানুষরা আগে এই উৎসবে শামিল হতেন। সম্প্রতি এটি সর্বজনীন চরিত্র নিয়েছে। অনুমান, এটি প্রায় পাঁচশো বছরের প্রাচীন মেলা (পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা)। নাগরাকাটার লুকসান চা-বাগানেও দীর্ঘদিন ধরে দোল উৎসব হয়ে আসছে। প্রতি বছর ভাদ্র মাসে ছয় দিন ধরে এই উৎসব হয় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে। ৬০ বছরের বেশি প্রাচীন এই উৎসব। এই সর্বজনীন উৎসবটি ছাড়াও ফাল্গুন মাসে যথারীতি তিন দিন ধরে দোল উৎসব হয়। মেটেলির ইনডং চা-বাগানেও শ্রমিকরা ফাল্গুন মাসে ফাগুরা উৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেন। এই উপলক্ষে নাচ-গানের আয়োজন হয়। তিন দিন ধরে চলে এই উৎসব। ফালাকাটার ঝাড়বেলতলিতেও এই দোল উৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। এ সময় পাঁচ দিন ধরে এখানে দোলের মেলা বসে। বেলতলি ভাগুনীতেও দোলের মেলা হয়। সাত দিন ধরে হওয়া এই মেলায় লোকগানের অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দোতরা গান। এই ফালাকাটারই গুয়াবাড়িও নগরের প্রমোদ নগরে দোলের মেলা হয় পাঁচ দিন ধরে। এটি প্রায় একশো বছরের পুরনো। স্থানীয় ও নিকটবর্তী গ্রাম থেকে অনেক মানুষ এই মেলায় যোগ দেন। বাণিজ্য ছাড়াও মেলার আকর্ষণ লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান, কুশানগান, হোলি গান ও যাত্রা। ছোট শালকুমারেও দু'দিন ধরে দোলের মেলা হয়।

কালচিনির সাতালি চা-বাগানেও দোলযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে। পঞ্চাশ বছরের বেশি প্রাচীন এই মেলাটি একদিনব্যাপী। সাতালি বস্তির এই মেলায় স্থানীয় আদিবাসীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। এখানে জামাকাপড় থেকে খাওয়াদাওয়া— সমস্ত বিকিকিনিই চলে। এ ছাড়াও কবিগান, পালাটিয়ার পাশাপাশি এখানে বোরো ভাষায় গান ও যাত্রাপালার উল্লেখ দেখা যায়। আলিপুরদুয়ারেরই চিকলিগুড়িতে দোলের মেলার প্রাচীন উল্লেখ দেখা যায়, এখনও ছোট আকারে মেলাটি হয়। ৮০/৮৫ বছরের প্রাচীন এই মেলার একটি বিশেষত্ব রয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে একটি গোটা বাঁশ পুঁতে তার সঙ্গে চৌদোলায় বিগ্রহ রাখা হয়। মেলায় হিন্দু-মুসলমানসহ সমস্ত ধর্মের মানুষ অংশ নেন। এখানেও পালাগানসহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

দোলপূর্ণিমার দু'দিন পরে ডুয়ার্সের শালকুমার হাটে দোল উৎসব হয়। পূর্ণিমার পরের দিন স্থানীয় মহাকালধামের প্রাঙ্গণে হোলি উৎসব হয়। এর পরদিন গোটা শালকুমারে হোলি খেলা হয়। দু'দিন ধরেই মহাকালধামের প্রাঙ্গণে মেলা বসে।

জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের খুব প্রিয় একটি মেলা 'আশ্রমের মেলা'। আশ্রমপাড়ার রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণর জন্মদিন উপলক্ষে এই মেলা আয়োজিত হত। রামকৃষ্ণদেবের আরাধনায় আশ্রমিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণে শহর, শহরতলির অগণিত মানুষ এখানে হাজির হন। জমে ওঠে মেলা। বিভিন্ন হাতের কাজের জিনিসপত্র ও শিশু-কিশোরদের মনোরম সামগ্রী এর মুখ্য আকর্ষণ ছিল। ক্রমশ এই মেলা সেই প্রাচীন জৌলুস হারাচ্ছে।

এই তিস্তাবঙ্গে আরও অনেক মেলা আলোচনার বাইরে রয়ে গেল। বিশেষত আদিবাসী জনতার মেলাগুলো। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এই অপূর্ণতার দায় লেখকেরই, আগামীতে তা পূর্ণ করার দায়ও নিচ্ছি তাই।

যুগযুগান্ত থেকে ভারতের জীবনচর্যার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে উৎসব। ধর্ম অনুষঙ্গ হলেও এই উৎসব গোটা সমাজেরই মিলন উৎসব। এই উৎসবই মেলার চেহারায় বিকশিত হয়েছে। মেলায় মানুষ মানুষের নিকটস্থ হয়েছে। মেলাই গড়ে তুলেছে এ দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের শিকড়হীন করার যে প্রক্রিয়া চালায়, তার অন্যতম এই উৎসব থেকে আমাদের বিচ্যুত করা। নানা বিভেদের বীজ এই সম্মিলনের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, কখনও নৃতত্ত্বের নামে, কখনও ভাষার নামে, কখনও ধর্মের নামে।

যুগযুগান্ত থেকে ভারতের জীবনচর্যার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে উৎসব। ধর্ম অনুষঙ্গ হলেও এই উৎসব গোটা সমাজেরই মিলন উৎসব। এই উৎসবই মেলার চেহারায় বিকশিত হয়েছে। মেলায় মানুষ মানুষের নিকটস্থ হয়েছে। মেলাই গড়ে তুলেছে এ দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি।

ইউরোপীয় মডেলের নাগরিক জীবনযাপন এই ভাঙন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। গ্রামীণ মেলা ও উৎসব ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে ওঠে এ সময় থেকেই। উৎসব ও মেলার যে শিকড় আমাদের গ্রামীণ জীবন সংস্কৃতিতে আমূল গেঁথেছিল তা থেকে উৎপাটিত হয়ে আমরা এক ত্রিশঙ্কু ও ত্রিভঙ্গ হাঁসজারু সাংস্কৃতিক পরিবেশে এসে উপনীত হয়েছি। ইউরোপীয় কার্নিভ্যালকেন্দ্রিক সম্মিলনের ভারতীয় রূপ হচ্ছে গ্রামীণ মেলাগুলো। আমরা আমাদের সমাজ সম্পর্ককে টপকে ওই ইউরোপীয় কার্নিভ্যালের অনুসরণ করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলছি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে। স্ব-আরোপিত ঔপনিবেশিক সংস্কারে আমরা নিজের অজান্তেই আক্রান্ত হয়েছি, এই আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে আমাদের মাটি। আজকের নাগরিক উৎসব উল্লাসে মেলা ব্রাত্য, আমাদের সংস্কৃতিও শিকড়চ্যুত ও ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং নিছক বাণিজ্য অভিমুখী নাগরিক মেলা ক্রমশ নগর ও গ্রামজীবনে ব্যাপ্ত হচ্ছে। লেক্সপ্রো, এক্সপ্রো প্রভৃতির চাপে দূরে হটছে উৎসবকেন্দ্রিক জনসম্মিলন।

গ্রামের মেলাগুলোও ক্রমশ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। বিনোদনের চরিত্র পালটে যাচ্ছে, চটুল ফিল্মি অনুষ্ঠান ও জুয়ার আসর জাঁকিয়ে বসছে এই মেলায়। বহুজাতিক সংস্থার বাণিজ্য কৌশলের সামনেও অসহায় আমাদের গ্রাম শিল্পের প্রাচীন বিপণন কাঠামো; আমাদের গোড়ার টান। রবীন্দ্রনাথের স্মরণ আবারও নিতে হয়, উৎসবের চরিত্র পালটে যাওয়াকে অনুধাবন করে যিনি শুরু করেছিলেন বিভিন্ন ঋতুকেন্দ্রিক উৎসব— বসন্ত উৎসব, মাঘোৎসব, হলকর্ষণের মতো উৎসব, যার শিকড় ছিল ভারত আত্মার গভীরে। মেলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খরাজ উদ্যোগে খুলিয়াই আসে— সুতরাং এখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লিগুলি যেদিন হাল লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।' আমাদের চেতনায় এই অভিভাবকের কথায় সুর মিলিয়ে তাই বলতে হয়, মেলাই আমাদের একে অন্যের কাছে আসার জায়গা। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, শাস্ত্র ও লোকায়ত যেখানে অনায়াসে মিশে যায়, মিলে যায় ধনী ও দরিদ্র, স্বতঃস্ফূর্ত এই জনসম্মিলনের মধ্যেই থাকে আমাদের নদী-মাটি-অরণ্য ও তার মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়; জীবনযাপনের চালচিত্র।

(সমাপ্ত)

ডুয়ার্সের পর্যটনে নদী-সৌন্দর্য

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার ডুয়ার্স এখন প্রকৃতি পর্যটনের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এখন ছুটে আসছেন মোহময়ী ডুয়ার্সের দিগন্তবিস্তৃত সৌন্দর্যের মোহে ও আকর্ষণে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার থেকে ওদলাবাড়ি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সবুজের দেশে পর্যটকদের জন্য সম্ভাব্য স্থলে টুরিস্ট লজ, হোটেল, কটেজ, হোমস্টে ইত্যাদি নির্মাণের বিশাল কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনা চলছে। প্রায় প্রতি মাসেই ডুয়ার্সের বনাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে টুরিস্ট লজ, হোটেল, মোটেল, কটেজ, হোমস্টে ইত্যাদি।

মন্ত্রী, পদস্থ আধিকারিক, তথ্যাভিজ্ঞ মহল, প্রকৃতিপ্রেমী, পরিবেশপ্রেমী পর্যটন ব্যবসায়ী, টুর অপারেটরস, ট্রাভেল এজেন্সি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ডুয়ার্স এলাকায় পর্যটকদের ঢল দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ধীরে ধীরে প্রকৃতি পর্যটন ডুয়ার্সের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। পাশাপাশি পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে ডুয়ার্স এলাকায় বিপুল কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ডুয়ার্সে প্রকৃতি পর্যটনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হল ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ। এই বনাঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম হল গোরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, বক্সা, জয়ন্তি, রাজাভাতখাওয়া প্রভৃতি বনাঞ্চল। বন্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত একশৃঙ্গী গন্ডার, হাতি, বাইসন, হরিণ, লেপার্ড প্রভৃতি। এ ছাড়া রয়েছে নানা প্রজাতির বৈচিত্রময় পাখপাখালি ও বিস্তীর্ণ

উদ্ভিদজগতের বিপুল সমাহার। তথ্যাভিজ্ঞ মহল ও প্রকৃতিপ্রেমীদের মতে, ডুয়ার্সের বন, বন্য প্রাণী, উদ্ভিদজগৎ, পাখপাখালি, সবুজ গালিচা পাতা চা-বাগান, ডুয়ার্সের নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা বর্ণের বৈচিত্রময় লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য অনেক উপকরণের বা উপাদানের পাশাপাশি ডুয়ার্সের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকা বিচিত্র নামের নদনদী ও ঝোরাগুলিও পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করে। বলা বাহুল্য, ডুয়ার্সের নদী-সৌন্দর্য ডুয়ার্সের প্রকৃতি পর্যটনের ক্ষেত্রে অন্যতম উপকরণ বা উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ডুয়ার্স এলাকায় বিচিত্র নামে নামাঙ্কিত নদীগুলি নিজ নিজ গতিপথে বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। ডুয়ার্সের লোকজীবনে এই নদীগুলিকে নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। এখানে নদীর নামে নবজাতকের নামকরণ করা হয়। নদীর নামে আছে নানা দেবদেবী। নদীতীরে গড়ে উঠেছে নানা দেবদেবীর মন্দিরও। ডুয়ার্সের নদীগুলি এখানকার মানুষের হৃদয়ে ও মননে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তাই তো নদীর নামে ট্রেন, স্টেশন, বাস, গ্রামগঞ্জ, চা-বাগান, বাজার, পথ, গলি, মোড়, হোটেল টুরিস্ট লজ, সংস্থা, ভবন ও আবাসনের নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকারও নামকরণ করা হয়েছে নদীর নামে। সাহিত্যে, লেখায়, প্রবন্ধে, রচনায়, কবিতায়, গানে, ছড়ায়, উৎসবে, লোকসংগীতে বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদনদীর নাম। সমাজজীবনে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, সামাজিক আচার, রীতিনীতি ও উৎসব ইত্যাদির সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে নদী।

ডুয়ার্সের এই নদীগুলি থেকে প্রাপ্ত বালি, পাথর, নুড়ি, নদীতে ভেসে যাওয়া গাছের ডালপালা সংগ্রহ, ফেরিঘাট, নদীতে মাছ ধরা ইত্যাদি নানা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ডুয়ার্সের বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা। ডুয়ার্সের পাহাড়ি নদীগুলি প্রধানত উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবহমান বিচিত্র নামে নামাঙ্কিত এই ছোটবড় নদীগুলি ডুয়ার্সের বুকে এক আশ্চর্য মায়াবন্ধন রচনা করেছে। কখনও পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কখনও জঙ্গলের বুক চিরে, আবার কখনও বা চা-বাগানের ভিতর দিয়ে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে অপরূপ সৌন্দর্য বিস্তার করে সমতলভূমির উপর দিয়ে গ্রামগঞ্জ পেরিয়ে মাইলের পর মাইল বয়ে চলেছে। অনুপম গিরিশৃঙ্গের উৎস থেকে নির্গত হয়ে কল্লোলিনী রূপে ডুয়ার্সের জীবসমাজকে মাতৃস্নেহের পুণ্য পীযূষধারায় লালন করে চলেছে ডুয়ার্সের নদীগুলি। নদীর স্বতঃস্ফূর্ত ফেনিল জলোচ্ছ্বাস ডুয়ার্সের মানুষের আনন্দের নিত্যসঙ্গী। শুধুমাত্র মনুষ্যসমাজই নয়, ডুয়ার্সের বিপুল সংখ্যক জীবজন্তু ও পক্ষীকুলের জলপান, জলবিহার ও অবগাহনের প্রধান ক্ষেত্র হল ডুয়ার্সের নদীগুলি। শীতকালে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা উড়ে এসে এই নদীবক্ষেই আশ্রয় গ্রহণ করে। নদীতীরের বৃক্ষ ও বনাঞ্চলে পরিযায়ী পাখিদের অবস্থান ডুয়ার্সের অনাবিল নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

ডুয়ার্সের নদীপ্রান্ত থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাসহ অন্যান্য শৈলশিখরের দৃশ্য রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। ডুয়ার্সের নদীতীরে দাঁড়িয়ে সকালের সূর্যোদয় ও বিকেলের সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য

যে কোনও মানুষকে মুগ্ধ করে। জ্যোৎস্না রাতে নদীতীরে বসে থাকলে দেখা যাবে, একরাশ পরিস্ফুট চন্দ্রিমা আছড়ে পড়েছে নদীর জলে। আর খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর জলে আছড়ে পড়া চাঁদের আলো যেন এক আশ্চর্য নৃত্য পরিবেশন করে— এ দৃশ্যও রোমাঞ্চকর। পাহাড়ি নদীগুলির প্রবহমান ধারায় আছে একটা শব্দ-ছন্দ। রাত যত গভীর হয়, ততই এই শব্দের তালে তালে বেজে ওঠে সুরঝংকার। গভীর রাতে পাহাড়ি নদীর প্রবহমান ধারায় এই সুরঝংকারের মূর্ছনা আছড়ে পড়ে সংলগ্ন চা-বাগান ও বনাঞ্চলের গভীরে। পাহাড়ি নদীর রাত্রিকালীন প্রবাহসংগীতের এই সুরঝংকার যে কোনও প্রকৃতিপ্রেমীর হৃদয় জয় করে।

ডুয়ার্স এলাকার প্রতিটি নদী ও ঝোরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক-একটি সৌন্দর্যের খনি। তবুও যে নদীগুলি নানা দিক থেকে আকর্ষণীয় ও পর্যটকদের মন জয় করেছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে— তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, ডায়না, মূর্তি, সংকোশ, বেথুয়া, রায়ডাক, ডিমা, চেকো, রায়মাটাং, কালজানি, মুজনাই, ধরলা, ডুডুয়া, আংরাভাসা, ডিমডিমা, রেভি, মাল, চেল, লিস, ঘিস, ন্যাওড়া প্রভৃতি। এ ছাড়াও ছোটবড় অনেক নদী ও ঝোরা রয়েছে।

এই নদীগুলি শীতকালে যেমন শান্ত ও কোমল, তেমনি বর্ষাকালে প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করে। জনজীবনে ঘটে বিপর্যয়। পাহাড়ি নদীর উদ্দাম তরঙ্গে প্লাবিত হয় ডুয়ার্সের জনপদ, অরণ্যভূমি ও চা-বাগান। শত শত বিঘা জমি বিলীন হয়ে যায় নদীগর্ভে। বহু মানুষ গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। নষ্ট হয় বহু ফসল— ঘটে প্রাণহানিও। এমনকি এই বন্যার ফলে বনাঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির পরেও ডুয়ার্সের মানুষ কিন্তু নদীকে কল্যাণকারী হিসেবেই গ্রহণ করেছে। বর্ষাকালে পূর্ণযৌবনা এই নদীগুলি বর্ণিত হয়েছে নানাভাবে। আর সেই কারণেই হয়ত নদীগুলির আঁকাবাঁকা পথের তালে তালে যুক্ত হয়ে রয়েছে ডুয়ার্সের মানুষের আলো-আঁধারি জীবনছন্দ।

ডুয়ার্সের নদী ও ঝোরাগুলিতে বিভিন্ন প্রজাতির ছোটবড় মাছ পাওয়া যায়। এগুলো ডুয়ার্সের সম্পদ। ডুয়ার্সের নদী থেকে প্রাপ্ত নদীয়ালি মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু। পর্যটকদের কাছে এ নদীয়ালি মাছের প্রবল চাহিদা আছে। ডুয়ার্সের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ নদীতে মাছ ধরেন এবং সেই মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, নদীর জলে বিষ মিশিয়ে এবং মশারি জাল দিয়ে অনেক সময় মাছ ধরা হয়। ফলে ছোট প্রজাতির নদীয়ালি মাছগুলির বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তি ঘটে। ইতিমধ্যেই ডুয়ার্সের বেশ কিছু প্রজাতির ছোট ছোট নদীয়ালি মাছের বিলুপ্তি ঘটেছে। অবিলম্বে বিষ মিশিয়ে ও মশারি জাল দিয়ে মাছ ধরার নির্মম প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল, প্রকৃতিপ্রেমী ও পর্যটনপ্রেমীদের মতে, ডুয়ার্সের অনাবিল নদী-সৌন্দর্যকে পর্যটকদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলো বিশেষ কাজ করতে হবে। প্রথমত, ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে দু'টি বা তিনটি নদীর মিলন ঘটেছে বা একটি নদী থেকে অপর একটি শাখানদী বা উপনদীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করে টুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সাধারণত লক্ষ করা গিয়েছে যে, যেখানে যেখানে দুটো নদীর মিলন ঘটেছে, সেইসব স্থানেই শীতকালে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে আসে। ওইসব স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পক্ষীকুল নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে ওই গাছগুলিতে অবস্থান করতে পারে। দ্বিতীয়ত, টুরিস্ট স্পট সংলগ্ন এলাকায় যেখানে নদী, বিল, ঝিল ইত্যাদি আছে, সেখানে যথাযথ সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করে পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য মেলে ধরতে হবে। পর্যটকরা যাতে সহজে ওইসব স্থানে পৌঁছাতে পারেন, সে জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হবে। তৃতীয়ত, নদীতীরের বাঁধসংস্কার, প্রয়োজনে নতুন বাঁধনির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদির মাধ্যমে নদীতীরগুলিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে হবে। যে সকল নদীতে স্নান করার সুবিধা আছে, সেখানে স্নানের ঘাট নির্মাণ ও বসার ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থত, সম্ভাব্য স্থলে স্পিডবোট, নৌকা ইত্যাদিতে পর্যটকরা যাতে জলবিহার করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাহাড়ি নদীর উপরে পর্যটকদের জন্য রোপওয়েও নির্মাণ করা যেতে পারে।

বন বিভাগের পক্ষ থেকে দেরিতে হলেও বন সংলগ্ন নদীতীরের সৌন্দর্যায়ন করে ডুয়ার্সে আগত পর্যটকদের কাছে তা মেলে ধরার শুভ প্রয়াস শুরু হয়েছে। বন বিভাগ ছাড়াও পর্যটন দপ্তর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই কাজগুলি করা যেতে পারে। এ ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পসহ নানা প্রকল্পে এই কাজগুলি করা সম্ভব। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে সেল্‌ফ হেল্প গ্রুপগুলিকে এসব কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

নানা কারণে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে ডুয়ার্সের জনজীবন। ডুয়ার্সের মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ডুয়ার্সের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু যে চা শিল্প, সেই চা শিল্পেও আজ দেখা দিয়েছে গভীর সংকট। কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। বাড়ছে বেকারত্ব, দারিদ্র, ক্ষুধা আর হতাশা। দারিদ্র ও বেকারত্ব যুবসমাজকে ঠেলে দিচ্ছে বিপথে। এরকম একটা অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্প ডুয়ার্সের মানুষের মনে বর্তমান রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় আশা জাগিয়েছে। সরকারের এই সদিচ্ছা ও শুভ প্রয়াসে ডুয়ার্সের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে, ডুয়ার্সে পর্যটন শিল্প বিকাশের মধ্যে দিয়ে ডুয়ার্সের বুকে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সবুজ দিগন্ত উন্মোচিত হোক— এটাই কাম্য।

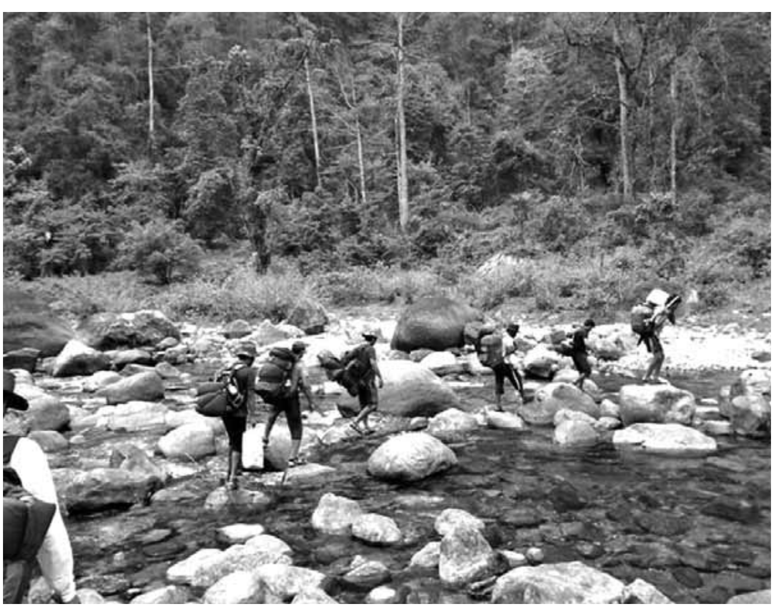

পরাণ গোপ

সমবায়ের ভিত্তিতে বাগান চালানোর পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত কি আদৌ ফলদায়ক?

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় এই চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **ষষ্ঠ পর্ব**।

লেখা যখন প্রকাশিত হবে, সময়কালেরও দ্রুত পরিবর্তন হবে। হয়ত কোনও বাগান খুলবে, আবার কোনও বাগানের ঝাঁপ বন্ধই থাকবে। তাই মহালয়ার প্রাক্কালে যখন বেরলাম, তখন তিন বাগানে তালা ঝুলেছিল এক পিতৃপক্ষে। ঠিক তিন বছর পর আর-এক পিতৃপক্ষের শুরুর দোরগোড়ায় তালা খোলার এমন বার্তা এল সরকারপক্ষের কাছ থেকে। বন্ধ রেডব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর এবং ধরণিপুর— তিনটি চা-বাগানকে সমবায়ের ভিত্তিতে চালু করার পাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ক্ষেত্র সমীক্ষাকালে বানারহাটে রেডব্যাঙ্ক টি গার্ডেনে এসেছি। সবকিছু ঠিকঠাক চললে পুজোর পরেই ফের মরচে ধরা সাইরেন সচল হবে তিন বাগানে। তাই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে আশায় বুক বেঁধে আছে বাগানে শ্রমিকদের সব ক'টি সংগঠনই। চা-বাগানের সমস্যাকে হাতের তালুর মতোই চেনেন সৌরভ চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের নবগঠিত টি ডিরেক্টরেটের অন্যতম সদস্য সৌরভ চক্রবর্তীর উদ্যোগেই এই সিদ্ধান্ত। রেডব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর এবং ধরণিপুরের জন্য ইতিমধ্যেই আলাদা আলাদা তিনটি সার্ভিস ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা হয়েছে। বাগান চালানোর জন্য ওই সমবায়গুলিকে ঋণ হিসেবে প্রাথমিক মূলধন দেবে জলপাইগুড়ি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। রাজ্য সরকারের তিন বাগানের শ্রমিক সমবায়কে স্বীকৃতি দেবার সংবাদ জানান চা-বাগিচার শ্রমিক নেতা হাসপাতালিয়া ওঁরাও।

বানারহাট থানার অন্তর্গত রেডব্যাঙ্ক চা-বাগানে গত বারো বছর ধরে খোলা-বন্ধের সাপ-লুডো চলছে। সর্বশেষ বাগানটি বন্ধ হয় ২০১৩-র ১৯ অক্টোবর। পাশের সুরেন্দ্রনগরেও একই দিনে তালা ঝোলে। নাগরাকাটা থানার ধরণিপুর বাগানটি বন্ধ হয় সে বছরেরই ২৪ অক্টোবর। তিন বাগানের স্থায়ী শ্রমিকসংখ্যা ৮৮৬, ৩১৭ এবং ৩৫০।

আগের মালিকের জমির লিজ বাতিল করার পর তিন বাগানেরই জমি রাজ্য সরকারের নিজের হাতে রয়েছে। জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি শেষ হয় ধরণিপুর, রেডব্যাঙ্ক এবং সুরেন্দ্রনগরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২০১৪-র ১৮ নভেম্বর, ২০১৪-র ২১ নভেম্বর এবং ২০১৫-র ৭ জানুয়ারি। বর্তমানে ধরণিপুর ছাড়া বাকি দু'টি বাগানের শ্রমিকরা রাজ্য সরকারের মাসিক অনুদান 'ফাওলাই' পাচ্ছে। ধরণিপুর বাগানটি স্থানীয় স্তরের সমবায়ের মাধ্যমে কাঁচা পাতা বিক্রি করে চলার কারণে গত জুলাই মাস থেকে সেখানে শ্রম দপ্তর ফাওলাই প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে।

চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরাম-এর অন্যতম শীর্ষনেতা তথা চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলমের সঙ্গে কথা হচ্ছিল জলপাইগুড়িতে সুবোধ সেন ভবনে। জিয়াউলদার কাছ থেকে জানা গেল, ওই চা-বাগানগুলি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে লিকুইডেশনের মামলা রয়েছে। রাজ্য সরকার সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেই হয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে তিনি আশাবাদী। সমবায় গড়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও জিয়াদার মতে, ওই সমবায়ে বাগানগুলির প্রকৃত শ্রমিক নন এমন কাউকে যেন না রাখা হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া পাওনাগন্ডা মেটাতেও প্রস্তাবিত সমবায়ে এগিয়ে আসা উচিত বলে জিয়াউলদার দাবি। তবে সার্ভিস ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি না করে প্রোডাকশন ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

রাজ্যে এই প্রথম চা-বাগিচায় সরকার স্বীকৃত সমবায় গঠিত হতে চলেছে। জলপাইগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব কোঅপারেটিভ দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি এবং বাগানগুলির শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া সমবায় বাগান চালাবে। কথা ছিল, পুজোর পরে সরকারি প্রতিনিধিরা বাগানে গিয়ে সমবায়ের কাজ শুরু করবেন।

রাজ্যে এই প্রথম চা-বাগিচায় সরকার স্বীকৃত সমবায় গঠিত হতে চলেছে। জলপাইগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব কোঅপারেটিভ দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি এবং বাগানগুলির শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া সমবায় বাগান চালাবে। কথা ছিল, পুজোর পরে সরকারি প্রতিনিধিরা বাগানে গিয়ে সমবায়ের কাজ শুরু করবেন। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শ্রমিকরা সমবায়ের মাধ্যমে কাঁচা চা-পাতা অন্যত্র বিক্রি করবেন, না নিজেদের ফ্যাক্টরিতে চা উৎপাদন করবেন তা সমবায়গুলির বৈঠকেই ঠিক করা হবে। রেডব্যাঙ্কের চা শ্রমিক বস্তিতে খবর এসে পৌঁছাল চা পর্ষদের চেয়ারম্যানের হাতে থাকা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সংস্থার ডেপুটি চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে চা পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাজ ও ক্ষমতা অনেকটাই কমে যাবে। চা পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যানের নিয়োগ পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিকভাবে হবে বলে স্বজনপোষণের সম্ভাবনা থাকবেই। সাধারণত এই পদে পদস্থ আমলাদেরই নিয়োগ করা হয়। গত কয়েক বছর ধরেই চা পর্ষদের স্থায়ী চেয়ারম্যান নেই। বর্তমান অস্থায়ী চেয়ারম্যান সন্তোষ সারেঙ্গি বেশির ভাগ সময়েই দিল্লিতে

থাকেন। চা পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান নিয়োগ রাজনৈতিকভাবে হবে বলেই ধারণা প্রবীণ চা-বাগিচা শ্রমিক নেতা জিয়াউল আলমের। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল প্রভাবিত সব ক'টি শ্রমিক সংগঠনকে ছাতার তলায় আনতে নির্দেশ দেন। দলের অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তথা মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় দলের সব ক'টি চা শ্রমিক সংগঠন ভেঙে দিয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে দেন। পরবর্তীকালে অবশ্য সেই ফেডারেশন কাজ শুরু করতে পারেনি। উত্তরবঙ্গের তৃণমূল শীর্ষনেতা তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা গেল, রাজ্যে ভোট ঘোষিত হবার ফলে নেত্রীর নির্দেশে সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে ফেডারেশন গড়ে দিয়েছিলেন তা কার্যকর হয়নি। দলের সাম্প্রতিক নীতিনির্ধারণ কমিটির সভায় তিনি বিষয়টি উত্থাপন করার পর উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে ফেডারেশন গড়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপর। অরূপবাবু যেহেতু দার্জিলিং জেলারও দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই অনেকটা সুবিধা তিনি পাবেন বলে আশাবাদী সৌরভ।

সারা ভারত বাগিচা শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক জিয়াউল আলমের মতে, দীর্ঘ সংগ্রামের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে চা-বাগিচায় পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে আর্থিক সহায়তা মিলছে। রাজ্য সরকারেরও উচিত চা শ্রমিকদের প্রাপ্য পরিষেবা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। চা-বাগিচার মালিকপক্ষকে বাগিচা শ্রম আইন মেনে পরিষেবা দিতে হবে চা-বাগানগুলিতে। জিয়াউল আলমকে প্রশ্ন করেছিলাম, ত্রিপুরাতে সমবায়ের ভিত্তিতে সফলভাবে চলা চা-বাগিচা রোল মডেল হিসেবে বাংলার বন্ধ এবং পরিত্যক্ত চা-বাগানগুলিতে প্রয়োগ করা যায় কি না। বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতার তাৎক্ষণিক জবাব, প্রাক্তন প্রয়াত চা শ্রমিক নেতা চিত্ত দে লিখিত আকারে এই প্রস্তাব টি বোর্ডে জমা দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ, পরিত্যক্ত চা-বাগানগুলিকে সমবায়ের ছাতার তলায় এনে সমবায় পরিচালনব্যবস্থাতে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, টি বোর্ড, শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধি রাখারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন চা শ্রমিক নেতা চিত্ত দে। জিয়াউল আলম মনে করেন, সমবায় পরিচালনব্যবস্থার সুফল পশ্চিমবঙ্গেও পেতে পারেন বন্ধ এবং পরিত্যক্ত চা-বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীরা। তিনি মনে করেন, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানে পুরনো চা গাছের গড় বয়স প্রায় ৬০ বছর। পুরনো চা গাছ কোটা অনুসারে উপড়ে ফেলে নতুন গাছ লাগানো প্রয়োজন। চায়ের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা। চায়ের গুণগতমান ভাল হওয়া জরুরি। নতুন চা গাছ লাগানোর কাজে টি বোর্ডের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকা অন্য খাতে খরচ করছেন কিছু মালিকপক্ষ। বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ বলে মনে করেন জিয়াউল আলম। তাই বাগিচা শ্রমিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্যমানের নিরিখে মজুরির দাবি উঠেছে সংগতভাবেই।

তবে চা-বাগিচাগুলি, চা শ্রমিক বা চা মালিকরা যতই সমস্যায় পড়ুক না কেন, ডানকানস গ্রুপের বাগানগুলির সমস্যা যেন তার থেকেও বেশি। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে সোনাপুর, বিধাননগর হয়ে হাঁসকুয়া, গঙ্গারাম বাগানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে শিলিগুড়ি ফিরে এলাম। ছবিটা মোটেই চা শিল্পের সুস্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক নয়। চোপড়া ব্লকের ডানকানস গ্রুপের লালবাজার, পাঁচ মৌজা, লক্ষ্মীপুর, গোয়ালগছ চা-বাগানে পুজোর মুখে বোনাস তো দূর অস্ত, চার মাসের বকেয়া পাওনাও পাননি শ্রমিক-কর্মচারীরা। গোয়ালগছ ডিভিশনের অধীন বেশ কয়েকটি বাগানে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। পুজোর আগে তারা মে মাসের বকেয়া বেতন পেয়েছে। বাকি চার মাসের পাওনা এখনও বাকি। পুজোর আনন্দে শামিল হলেও মন খারাপের আবহ শ্রমিকমহল্লায়। ডানকানস গ্রুপে বিভিন্ন সমস্যা চললেও চোপড়া ব্লকের ডানকানস গ্রুপের সব ক'টি বাগান এখনও চালু। ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ডানকানস গ্রুপের বাগানগুলোর বোনাস বৈঠক কার্যত ভেস্তে গিয়েছে। বৈঠকে মালিকপক্ষ মাত্র ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। শ্রমিকপক্ষ ওই হারে বোনাস নিতে চায়নি। ইসলামপুরে লিমটেক্স গ্রুপের আওতাধীন তিনটি বাগান আছে। বিধাননগরে একই মালিকের বটলিফ ফ্যাক্টরি আছে। ইসলামপুরের সুজালি, গাঞ্জাবাড়ি এবং গ্রিনকার্ড চা-বাগানগুলির মধ্যে গ্রিন কার্ডের শ্রমিকদের অভিযোগ, তাদের কোনও প্রতিনিধিকে মালিকপক্ষ বৈঠকে ডাকেননি, তাদেরকে বাদ দিয়েই ১৩ শতাংশ বোনাস স্থির হয়। তাই গ্রিন কার্ড বাগানের শ্রমিকরা ওই চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। ওই বাগানে ১২৬ জন স্থায়ী শ্রমিক রয়েছে। তাদের দাবি, বড় বাগানের ক্ষেত্রে ১৮-১৯ শতাংশ বোনাস হয়েছে এবং লিমটেক্স গ্রুপ বিধাননগরে ১৯ শতাংশ হারে বোনাস দিয়েছে। লিমটেক্স গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার জানিয়েছেন, তিনটি বাগানের মধ্যে দু'টিতে ১৩ শতাংশ হারে বোনাস নির্ধারিত হয়েছে শ্রমিক নেতাদের উপস্থিতিতে চুক্তি অনুসারে। তাঁর মতে, বিধাননগরের বটলিফ ফ্যাক্টরি এবং ইসলামপুরের ওই তিনটি চা-বাগান আলাদা প্রোজেক্ট। তাই বটলিফ ফ্যাক্টরির বোনাস এবং বাগানগুলির বোনাসের ক্যাটেগোরি এক নয়। টিপার সম্পাদকও জেনারেল ম্যানেজারের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, চুক্তি মোতাবেক বড় বাগানে যেমন ১৮-১৯ শতাংশ বোনাস হয়েছে, তেমনি লোকসানে চলা চা-বাগিচাগুলিতে ৮-৯ শতাংশ হারেও বোনাস হয়েছে। বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে তিনি শ্রমিকদের অনুরোধ জানিয়েছেন। কাজেই ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে লক্ষ করছি, শুধুমাত্র মালিকপক্ষকেই দোষ দিলে হবে না। এক শ্রেণির শ্রমিক ফাঁকবাজি করে, শ্রমদান না করে, মালিককে শ্রেণিশত্রু ভেবে চিরকাল দর কষাকষির রাস্তাতেই হাঁটতে চায়। সমস্যা

এখানেই। মালিকপক্ষও বেতন বা বোনাস বাড়াতে নারাজ। অন্য দিকে শ্রমিকরাও বেপরোয়া।

উত্তরবঙ্গের শতাব্দীপ্রাচীন চা-বাগিচা শিল্প গভীর সংকটের ভিতর দিয়ে চলছে। উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত চা-বাগানগুলি নিয়ে রাজ্য সরকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, দিল্লি কম্পমান—তবু কেউ সংকটমোচনের সমাধানসূত্র বার করতে পারছেন না। এই অচল অবস্থার মুখে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের ছোট চা চাষিরাও আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন। সবুজ চা-পাতার দাম নির্ধারক একমাত্র সংস্থা বটলিফ ফ্যাক্টরিজ বা বিএলএফ তাদের ইচ্ছামতো যা খুশি দাম নেওয়ার ফলে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সবুজ চা-পাতার দাম নির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করার দাবিও উঠেছে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে। যেসব বাগান ব্যবহৃত চা-পাতা পুনরায় ব্যবহার করে, তাদের লাইসেন্স বাতিল করার আবেদনও জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে এতদিন পর্যন্ত সবুজ চা-পাতার নির্দিষ্ট কোনও দাম ছিল না। বটলিফ ফ্যাক্টরিজ নিজেদের পছন্দমতো দাম ঠিক করে বাগানগুলি থেকে সবুজ চা-পাতা কিনে নিত। কখনও এগুলি বিক্রি হত কুড়ি টাকা কেজি দরে, কখনও বা তা নেমে দাঁড়াত চার-পাঁচ টাকায়। ফলে সবুজ পাতার দাম নির্ধারণে একচেটিয়া অধিকার লাভ করছিল বিএলএফ। তাই টি বোর্ডকে একটি সর্বস্বীকৃত নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। স্মল টি গ্রোয়ারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সর্বভারতীয় নেতা বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর মতে, সবুজ চা-পাতার কত দাম হওয়া উচিত, এবং এটিকে প্রক্রিয়া করার খরচ কত পড়তে পারে, তার হিসেব টি বোর্ড ঠিক করে দিলে সেই দাম অনুসারেই বিএলএফ-কে শ্রমিকদের কাছ থেকে চা-পাতা কিনতে হবে।

> উত্তরবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প না থাকার ফলে আনারসের কোনও বাজার না পাবার জন্য স্থানীয় বাজারে তাদের কাঁচামাল জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয়। ইসলামপুরের বিধাননগর এলাকার উৎপাদিত আনারস বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে চালান দিয়েও বিধাননগরের আনারস ব্যবসা লাভজনক ছিল না। উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ আসত খুবই কম।

ইসলামপুর এবং চোপড়া অঞ্চলে অর্থাৎ তরাইতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে যে চিত্র পেলাম তা আরও ভয়ংকর। ২৫-৩০ বছর আগে শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরের কিছু বিত্তশালী কৃষিজীবী ব্যক্তি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ, শিলিগুড়ির তরাই এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমায় তাদের দখলে থাকা ধানি জমি বিক্রি করে ব্যাপকভাবে আনারস চাষ শুরু করে দেয়। উত্তরবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প না থাকার ফলে আনারসের কোনও বাজার না পাবার জন্য স্থানীয় বাজারে তাদের কাঁচামাল জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয়। ইসলামপুরের বিধাননগর এলাকার উৎপাদিত আনারস বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে চালান দিয়েও বিধাননগরের আনারস ব্যবসা লাভজনক ছিল না। উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ আসত খুবই কম। ফলে নবাগত আনারস চাষিরা আটের দশক থেকে আনারস চাষ তুলে দিয়ে সেখানে ব্যাপকভাবে চা-চারা রোপণ করে ছোট ছোট চা-বাগিচার পত্তন করে। চাষিরাও ধান এবং পাটজাত ফসল কমিয়ে দিয়ে চায়ের খেত তৈরিতে মনোযোগী হয়ে উঠল। প্রত্যাশা ছিল, এতে তরাইসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার চাষিদের হাতে কাঁচা পয়সা আসবে এবং আর্থিক সচ্ছলতা বাড়বে। এই চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতার গ্রাহক ছিল শতাব্দীপ্রাচীন এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত বড় বড় বাগান, যেগুলির নিজস্ব ফ্যাক্টরি ছিল। ১৯৮৮ সালের পরবর্তীকালেও বড় বড় বাগান ছোট ছোট চা চাষির কাছ থেকে সাড়ে ৩-৪ টাকা প্রতি কেজি দরে পাতা কিনত। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে বড় বড় বাগানে রাসায়নিক সার, কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল পরিবহণের বাজারদর আকাশছোঁয়া হবার ফলে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির আঁচ লাগল ছোটবড় উভয় ধরনের চা উৎপাদনকারীদের উপর।

উত্তরবঙ্গের তরাই এবং ডুয়ার্সের প্রচুর বাগান ডানকানস গোষ্ঠীর হাতে। তাই ডুয়ার্স এবং তরাইয়ে এসে বাগান পরিদর্শন করে, ম্যানেজার ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ডানকানস গোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। মালিককে কাছে পেয়ে নিজেদের বঞ্চনা ও যন্ত্রণার ডালি উপুড় করতে কোনও কার্পণ্য করেননি ভুক্তভোগী শ্রমিকরা।

ভারতীয় চায়ের দাম এবং চাহিদা কমে যাবার ফলে অবস্থা চরম আকার ধারণ করল।

তবে এটা একশো শতাংশ সত্যি যে, জট কাটাতে ডানকানস গোষ্ঠী আগ্রহী। উত্তরবঙ্গের তরাই এবং ডুয়ার্সের প্রচুর বাগান ডানকানস গোষ্ঠীর হাতে। তাই ডুয়ার্স এবং তরাইয়ে এসে বাগান পরিদর্শন করে, ম্যানেজার ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ডানকানস গোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। মালিককে কাছে পেয়ে নিজেদের বঞ্চনা ও যন্ত্রণার ডালি উপুড় করতে কোনও কার্পণ্য করেননি ভুক্তভোগী শ্রমিকরা। তরাইয়ের গঙ্গারাম চা-বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিরা কথা বলেন তাঁদের মালিকের সঙ্গে। চা শিল্পের প্রেক্ষাপটে রাজ্যব্যাপী হইচই ফেলে দেওয়া ডানকানস সংকটের পর গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা কেন্দ্রীয় অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তির বাইরে থাকা চা-বাগানগুলি পরিদর্শনে আসেন। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালগছ, পাটাগড়া হয়ে নাগেশ্বরী এবং ডুয়ার্সের কিলকট ও বাগরাকোট চা-বাগান পরিদর্শন করেন। বাগানগুলির ফ্যাক্টরির অবস্থা, অন্যান্য বিষয় পরিচালকদের কাছ থেকে বুঝে নেন। ডানকানসের বাগরাকোট, নাগেশ্বরী এবং কিলকট— এই তিন চা-বাগানের সুপারিনটেন্ডিং ম্যানেজার চন্দ্রপ্রকাশ কাপুর প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, ‘মালিক গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা বাগানগুলি পরিদর্শন করে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। তিনি আসায় সকলের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে।’ ডুয়ার্সের বাগরাকোট চা-বাগানের শ্রমিক নেতা লরেন্তুস লাকড়া, নাগেশ্বরীর রবি ওঁরাও কিংবা কিলকটের রামচন্দ্র পজারের আশা, সুদিন ফিরবেই। জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক মণিকুমার দার্নাল দাবি করেছেন, অতীতের গর্ব ডানকানস গোষ্ঠীর চা-বাগানগুলিকে রুগ্‌ণ করে তোলার জন্য কিন্তু মালিকপক্ষই দায়ী। বিজেপি-র চা শ্রমিক নেতা জন বারলার মতে, ভাল করে বাগান চালানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ডানকানসের কর্ণধারদের। শ্রমিকদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাগন্ডা মেটাতে হবে।

তবে ডানকানস কর্তৃপক্ষর বাগান খোলার সদিচ্ছা আছে। ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পর্যবেক্ষণ এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার এই নির্যাস ছাপার আকারে যখন বেরবে, তখন হয়ত বা আমার রেডব্যাঙ্ক, ধরণিপুরসহ অন্যান্য বাগানে চা-বাগিচার মদির মাদকতায় মত্ত আদিবাসী চা শ্রমিকদের অনাবিল হাসি আমাদের মনে খুশি এনে দেবে। বাগান খুলতে উত্তরকন্যায় টি ডিরেক্টরেটের দুই শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেছেন ডানকানসের অন্যতম কর্তা জি পি গোয়েঙ্কা। দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ হয়ে থাকা ডানকানসের ডুয়ার্সের ৭টি বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিকের কষ্ট লাঘব করার জন্য তাঁরাও মরিয়া প্রয়াস নিয়েছেন। বাগান খুলতে ডানকানস কর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। বাগান খোলার ক্ষেত্রে বাগানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, বাগান নিয়ে আর কোনও মামলা যাতে না হয়, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা এবং বাগান চালাতে আর্থিক সাহায্য করার বিষয়ে টি ডিরেক্টরেটের অন্যতম সদস্য সৌরভ চক্রবর্তী ও মোহন শর্মার সঙ্গেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন জি পি গোয়েঙ্কা। মালিকপক্ষ বাদে অন্যান্য মহলের আপাত সদিচ্ছা সত্ত্বেও ঢাকঢোল পিটিয়ে সংগঠিত মজুরি বৃদ্ধির বৈঠকগুলো খুব সুষ্ঠু সময়োপযোগী সমাধানের দিকে এগচ্ছে না। বাগান মালিকরা শ্রমিকদের পাওনা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে আসছেন দিনের পর দিন। ২০১১-র মজুরি চুক্তির পরেও ডুয়ার্সের কিছু কিছু বাগান শ্রম দপ্তরের জ্ঞাতসারেই কম মজুরি দিচ্ছে বলে খবর আছে। বন্ধ বাগান খোলার ফিরিস্তি নয়, শ্রম দপ্তরটা যে শ্রমিক স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে এবং ব্যবহারিক সুবিধার কারণে তৈরি হয়েছে, সে উদ্দেশ্যই গৌণ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিক স্বার্থরক্ষায় শ্রম দপ্তরটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই গৌণ হয়ে গিয়েছে। তাই সুস্পষ্ট আইনকানুন এবং যুক্তিতর্কের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত হোক এক মজুরি কাঠামো। তাপ্পি মারা লোক দেখানো চটজলদি সমাধানসূত্র নয়, লোক দেখানো ম্যানেজসর্বস্ব মজুরি চুক্তির সংস্কৃতি নয়, রাতারাতি সবকিছু বদলে দেওয়া নয়— চা শিল্পকে নিয়ে প্রহসন বন্ধ হোক।

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

ডুয়ার্স ভূখণ্ডে কাব্যচর্চার বিশাল রূপ বাংলা সাহিত্যজগতে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে ‘ডুয়ার্সের হাজার কবিতা’ বইটি। শতাধিক কবির সহস্রাধিক কবিতার এই অভূতপূর্ব সংকলনটি প্রকাশের পর অভিভূত হতে শোনা গিয়েছে অনেককেই। গত ২২ শ্রাবণ বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানটিও ছিল জমজমাট। বাইরে থেকেও কবিতাপ্রেমীরা এসেছিলেন ঔৎসুক্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বইটির অলংকরণ ও কলেবর প্রশংসিত হয়েছে নানা মহলে। প্রথম থেকেই ঠিক করা হয়েছিল, এই বই প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করবেন কবিরাই। একটি বইয়ের দামে কবিদের দু’টি বই দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু বই প্রকাশের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অথচ এখনও অর্ধেকের বেশি সংখ্যক কবি তাঁদের কপি সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্যোগ বা উৎসাহ প্রকাশে বিরত। কবিতা পাঠানোর ব্যাপারে যে উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বই প্রকাশের পর তা সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে এই ধরনের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উৎসাহে ভাটা পড়তে বাধ্য, যা মোটেই কাম্য নয়। কবি-বন্ধুদের তাই অনুরোধ, যাঁরা এখনও নিজেদের কপি সংগ্রহ করেননি, তাঁরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। আপনার হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে আমরা রাজি। আমরা চাই ডুয়ার্সের কাব্যচর্চার সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

প্রকাশক

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

বহুচর্চিত 'দন্ডকারণ্য' কান্ডের স্মৃতি উস্কে দিলেন লেখক এবারের পর্বে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীর সমস্যা সমাধানে বিধানচন্দ্র রায়ের ঐতিহাসিক আন্দামান পরিকল্পনা আজ সফল, কিন্তু সেদিন কারা নেমেছিল বিরোধিতায়? দন্ডকারণ্যে রাজনৈতিক পদক্ষেপ কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি লেখককে দাঁড় করিয়েছিল, সেই বিবরণের পাশাপাশি লেখকের দিল্লি বসবাসের গোড়ার স্মৃতি। লেখকের মনে পড়ছে সেই শিহরণ জাগানো স্লোগান এবং নিজের লেখা একটি লিমেরিক-এর কথাও। সব মিলিয়ে প্রবীণ পাঠকের স্মৃতি যেমন উদ্ভাসিত হবে তেমনই নব্য প্রজন্মের পাঠক ভাবতে বসবে নতুন করে। যাচাই করে নেবে ইতিহাসকে একবার। পড়তে থাকুন।

১৯৭৯-'৮০ সাল কখনও দিল্লি, কখনও কলকাতা— দু'জায়গাতেই নিজের প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হয়েছে। কারণ অঙ্কটা ছিল, দিল্লির ঘনিষ্ঠতা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া সুনিশ্চিত করবে— আর জেতবার জন্য রাজ্যে নিজেকে পাদপ্রদীপের আলোতে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। তাই মে মাস যখন তিহার জেলে কেটেছে, তখন মার্চ মাস কেটেছে রাজ্য পুলিশের হাতে নির্যাতনের অভিজ্ঞতা নিয়ে।

যেটা বলা হয়নি, দল ভাঙাভাঙিতে প্রভাস শ্যামের মাসোহারা অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খাব কী! কিছুদিন পিয়ারলেস করলাম। অন্তত উঞ্ছবৃত্তি বন্ধ হল। কিন্তু দিল্লি থাকতে শুরু করাতে তাতেও ছেদ পড়ল। বাসুদেব পানিক্কর ছিল যুব কংগ্রেসের আর-একজন সাধারণ সম্পাদক। কেরালার ছেলে, চালাক-চতুর। ওকে বললাম, তুমি তো তবুও দুপুরবেলায় ব্রেড-বাটার খাওয়াচ্ছ। কিন্তু রাতের ব্যবস্থা আমি আর জোগাড় করতে পারছি না। ও বলল, দাঁড়াও। আমি ব্যবস্থা করছি। আমার একটা টুর দেখিয়ে ২,০০০ টাকা এআইসিসি থেকে আদায় করে দিল। তখনকার দিনে অনেক। এদিকে কলকাতায় সুব্রতদাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়াতে সোমেনদার সঙ্গে বরকতদার ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার পরিণতিতে একদিন সোমেনদা পদত্যাগ করলেন রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে। প্রসঙ্গত বলি, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৮-এ কংগ্রেস যুব ফোরাম যখন রাষ্ট্রীয় যুব কংগ্রেসে রূপান্তরিত হয়, তখন রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব সোমেনদার উপর অর্পিত হয়েছিল। আমরা চাইনি সোমেনদা পদ ছাড়ুন, আবার বরকতদার প্রভাবও অস্বীকার করার মতো ছিল না। তার উপর প্রণবদাও মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন, পদত্যাগ গৃহীত হোক।

সে সময়ে সঞ্জয়জির হস্তক্ষেপ হওয়াতে তিনি ডেকে পাঠিয়ে সোমেনদা ও বরকতদার মিটিং করিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে একটা সাময়িক স্থিতাবস্থা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এটা যে টেকেনি, সে কথা আগেই জানিয়েছি। কালীবাড়ি ছেড়ে রামদার বাড়িতে আস্তানা গাড়বার মাঝখানে যে কিছুদিন আজমিরি গেটে থাকবার সুযোগ হয়েছিল, সেটাও এই সময়েই। দিল্লির বিমান ভাড়া জোগাড় করে তিনজনকে নিয়ে রাত একটায় বিমানবন্দরে নেমে অনয় গোপাল যখন বলল, আজমিরি গেটে ওর এক বন্ধুর ডেরা আছে, আমি হাতে চাঁদ পেলাম। কারণ কালীবাড়ি ইতিমধ্যেই 'লাল সংকেত' দিয়ে দিয়েছে। চারদিকে ঘুঙুরের আওয়াজ আর তবলার বোল। অনয় বলল, এটাই এখানকার 'রেড লাইট' এরিয়া। কিন্তু আমরা তো আর ওদিকে থাকছি না। রাস্তার এদিকটায় সব দোকানপাট। কাজেই থাকতে কী আপত্তি? আপত্তি করার মতো অবস্থাও আমাদের ছিল না। একটা বিকল্প জায়গা পেয়েছি, সেটাই অনেক। এভাবেই দিল্লির ঠিকানার বদল ঘটল।

প্রণবদা তাঁর 'ড্রামাটিক ডিকেড'-এ ১৩১ পাতায় আমার কথা বলেছেন, সেটা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

যে দিন ইন্দিরাজি গ্রেপ্তার হলেন ও তার পরদিন পার্লামেন্ট স্ট্রিট কোর্টে ওঁকে আনা হল, আমি, প্রণবদা ও বসন্ত সাঠে একই গাড়িতে এ কোর্ট-ও কোর্ট হয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিট কোর্টের সামনে দেখি অন্তত পাঁচ হাজার লোকের মিছিল ইন্দিরাজির পক্ষে স্লোগান দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে। জাস্টিস দয়ালের আদালতে ইন্দিরাজিকে হাজির করা হল। উনি বেল না, মামলাটাই খারিজ করে দিলেন। এই মানুষটির সঙ্গে পরে একবার তাঁর বাড়িতে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। যা-ই হোক, তখন দিল্লির কংগ্রেস পথে। আর আমি তাঁদের সঙ্গে।

এরই ভিতর একটা সুখস্মৃতি মাঝে মাঝে উঁকি মারে। খবর এল, আসাম সীমান্তে নাগাল্যান্ড পুলিশের গুলিতে কিছু নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছে। রাংমা ও দায়াং ফরেস্ট এলাকায়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, যদিও ১৯৬৩ সালে নাগাল্যান্ড গঠিত হয়েছে, এখনও দুই রাজ্যের সীমানা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। যা-ই হোক, ঠিক হল, প্রণবদা যাবেন উপদ্রুত এলাকা দেখতে এবং সঙ্গে আমি। আসামে তখন আমরা মাত্র ৮টি আসন পেয়েছি। যদিও নির্বাচনে আমরা সকলেই প্রচারে এসেছিলাম। আমি, সোমেনদা, নুরুলদা, প্রণবদা ও বরকতদা। আমাদের ভাষণ শুনত, কিন্তু তারপরেই 'বঙ্গালের মানু আহিয়াসে' বলে চলে যেত। যা-ই হোক, প্রণবদা এলেন,

সঙ্গে আমি। বিজয় হেনরিক সাহেব আমাদের উপদ্রুত এলাকাগুলি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। দিন চার-পাঁচ একসঙ্গে ছিলাম। একই ঘরে থাকতে হত। এক বিছানায় আমি, আর-এক বিছানায় প্রণবদা। আমার খেতে পারায় নাম ছিল। একদিন গোলাঘাট বাংলোতে কেউ এক হাঁড়ি রসগোল্লা দিয়ে গিয়েছে। ঘরে আমি আর প্রণবদা। দাদা বললেন, মিঠু, এখন কেউ নেই। এগুলির প্রতি ন্যায়বিচার করো। আমি টপাটপ একটার পর একটা রসগোল্লা মুখে ফেলছি, এমন সময় কেউ একজন দেখা করতে এসে দরজা খুলেই সেই দৃশ্য দেখে 'ওরে বাপ' বলে উধাও হয়ে গেলেন।

আজকের প্রজন্ম হয়ত জানে না যে, দেশ বিভাজনের পর যখন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে ডাঃ বিধান রায় কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করিয়ে আন্দামানের বুকে আর-একটা নতুন বাংলা গড়তে চাইলেন, তখন বামপন্থীরা নানাভাবে ছিন্নমূল মানুষগুলিকে প্ররোচিত করে এই কর্মসূচিকে বানচাল করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। ডাঃ রায়ের দূরদর্শিতা যে কত সঠিক ছিল, তার প্রমাণ, আজ সমুদ্রের ওপার থেকে লোকসভায় কখনও মনোরঞ্জন ভক্ত অথবা কখনও বিষ্ণুপদ রায় জিতে আসছেন। তাঁদের আটকাতে না পেরে চেষ্টা চলল, মূল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাদের পুনর্বাসিত করা হল, তাদের কী করে দণ্ডকারণ্য থেকে, পিলিভিত থেকে অথবা বস্তার থেকে ফিরিয়ে এনে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা যায়। সেটা বামেদের একটা অন্যতম কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তারাই যখন সরকারে এল, তখন রাজ্যের এক মন্ত্রী দণ্ডকারণ্যে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন, এখন রাজ্যে তোমাদের সরকার, তোমরা বাংলায় ফিরে এসো।

চল্লিশ হাজার উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে এল নতুন স্বপ্ন বুকে নিয়ে। মোহভঙ্গ হতে সময় লাগল না। প্রথমে বর্ধমানের কাশীপুর শিবির থেকে যখন তারা নড়তে চাইল না, তখন গুলি চলল। প্রবল বৃষ্টির ভিতর খোলা ট্রাকে মানুষগুলোকে তুলে নিয়ে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। অবস্থা প্রতিকূল বুঝে এদের একটি দল এক দুঃসাহসী মানুষ হারাধন গোলদারের নেতৃত্বে সুন্দরবনের কোনও এক জনমানবহীন দ্বীপ— মরিচঝাঁপিতে নতুন করে বাসা বাঁধল। গ্রাম গড়ে তুলতে পানীয় জল, প্রাথমিক বিদ্যালয়— সবই অল্প সময়ের ভিতর মরিচঝাঁপিতে পত্তন করে তারা যে সহজে ফিরে যেতে আসেনি, সে বার্তা পৌঁছে দিল।

আজকের প্রজন্ম বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সৌজন্যে সিঙ্গুর দেখেছে, নন্দীগ্রাম দেখেছে। পুলিশি বর্বরতার জবাব দিয়েছে ভোটের মাধ্যমে। '৭৯ সালে টিভিই আসেনি। তাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কোনও সুযোগ ছিল না, সে দিনের শ্বেতসন্ত্রাসকে রাজ্যের মানুষকে দেখাতে পারে। আমরা মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছিলাম, ওখানে অবরোধ চলছে। অর্থাৎ দ্বীপের মানুষগুলি যদি মূল ভূখণ্ডে না আসতে পারে, তাহলেই আস্তে আস্তে অনাহারের শিকার হয়ে দ্বীপ ছাড়তে বাধ্য হবে। তাই জল পুলিশের ব্যবস্থা হল। অতন্দ্র প্রহরা। কেউ জলে নামলেই গ্রেপ্তার।

আমাদের কোর গ্রুপে ঠিক হল, আমরা যাব। আমি, বীরেনদা, সোমেনদা। জেলা থেকে কেউ কেউ ছিলেন— আজ তাঁদের নাম মনে নেই। তবে কলকাতা থেকে পরেশ পাল ছিল— ওর কথা খেয়াল আছে। মরিচঝাঁপি আর মূল ভূখণ্ডের মাঝখানে যে নদীটা রয়েছে, তার নাম কুমিরমারি। আমরা কুমিরমারির পাড়ে যেতেই ওপার থেকে মাইকে বলতে লাগল— 'আপনারা এসে দেখে যান, আমরা কীভাবে অবরুদ্ধ হয়ে আছি। বাচ্চাদের কোনও শিশুখাদ্য নেই, বড়দের পেটে ভাত নেই, গাছের পাতা সেদ্ধ করে খেতে হচ্ছে, জলে নামলেই গুলি চলছে।' আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে ওপারের মানুষগুলিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, নৌকা নাও, এখনই চলো। দলের স্থানীয় কর্মী সুব্রত সানা বলল, 'তা কী করে হয়! আমি বাড়িতে রান্না করিয়ে রেখেছি। আগে খেয়ে নিন। তারপর যাবেন।' মাইকের করুণ আবেদন শুনে আমার মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি যদি ওদের কোনও ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারতাম। আর তখন শুনছি— 'না খেয়ে যেতে পারবেন না।' বীরেনদা সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'তা-ই চল। আগে সুব্রতর বাড়িতে খেয়ে নিই, তারপর নৌকা নিয়ে এগব।' আমি বললাম, আমি খাব না। বীরেনদা বলল, 'পেটের গোলমাল? তাহলে খাস না।' আমি বলতে চাইলাম, না, গোলমাল পেটে নয়, বুকে। তোমরা হৃদয়হীন, তোমরা খাও। আমি অন্তত নিজের বিবেককে বলতে পারব, একটা প্রতীকী অনশন তো করেছি।

যা-ই হোক, ভোজন পর্ব শেষ করে নৌকো নিয়ে নদীতে নামা হল। পাঁচ মিনিটও হয়নি, জল পুলিশ এসে নৌকো থামিয়ে বলল, আপনারা ১৪৪ ধারা ভেঙেছেন। আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল। সারাদিন বসিয়ে রেখে সন্ধেবেলায় ছেড়ে দিল। আমরাও ফিরে এলাম মানুষগুলোকে হতাশ করে। কিন্তু ঠিক হল, এর একটা প্রতিবাদ করতেই হবে। মহাকরণ অভিযানের কর্মসূচি নেওয়া হল বরকতদার নেতৃত্বে। সে দিন যে স্লোগান তুলেছিলাম, আজও দেখা হলে কেউ কেউ বলে (যে ছিল সেই মিছিলে), মিঠুদা, আর-একবার বলো না, যে স্লোগান দিয়েছিলে। এখনও শিহরিত হই সে দিনটা ভেবে। স্লোগান ছিল—

'প্রতিবাদে, প্রতিরোধে
মুখরিত বাংলা, জনগণ রাজপথে লড়ছে
জল নেই, আলো নেই, চারিদিকে,
নেই নেই, উদ্বাস্তুর লাশ শুধু জমছে।'

শ্যামল দত্ত ছিলেন ডিসি, সেন্ট্রাল। কী কারণে জানি না। মিছিলটা পুলিশ সেভাবে না আটকানোতে রাইটারস' অবধি পৌঁছে গেল। ভিড় যখন রাইটারস'-এর মূল ফটকে আছড়ে পড়ছে, তখন পুলিশের ঘুম ভাঙল এবং অবিশ্রান্ত লাঠিচার্জ। বরকতদা রাস্তায় বসে পরে ভাবলেন, ওরা আমায় চিনবে, কাজেই আমায় মারবে না। সপাসপ লাঠি। বরকতদাকে বাঁচাতে গিয়ে নুরুলদা নির্মমভাবে প্রহৃত। আমি রাইটারস'-এর উলটো দিকে পুলকারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি। রাইটারস'-এর দোতালার বারান্দা থেকে কোঅর্ডিনেশনের নেতারা চিৎকার করছে, 'ওই দাড়িওয়ালাটাকে মারুন।' রেলিং-এর ভিতরে গিয়ে দেখি সব ক'টা পুল কার ভরতি করে দলের কর্মীরা বসে আছে। আমাকে দেখেই ডাকতে শুরু করল, 'মিঠুদা, এটায় উঠুন, এটায় উঠুন।' আমার মন বলছিল, ওখানেও বিপদের গন্ধ আছে। আমি ওখান থেকে এগবার পরই পিছন ফিরে দেখি পুল কারগুলি থেকে টেনে টেনে ছেলেদের বার করছে, আর বেধড়ক লাঠিপেটা করছে কলকাতা পুলিশ।

একটু এগিয়ে মিনিবাস স্ট্যান্ড। দেখি কোনও মিনিবাস খালি নেই। সবই তাড়া খাওয়া দলের ছেলেতে বোঝাই। মনে হল, এই জায়গাটাও নিরাপদ নয়। ঠিক তা-ই। আমি এগলাম। আর তারপরেই আর্ত চিৎকার। পুলিশ বাসগুলোয় উঠে নির্বিচারে লাঠি চালাচ্ছে। আমি জিপিও-তে ঢুকে পড়লাম। একজন দেখেই বলল, 'আপনি মিছিলের লোক, বার হন, বার হন, আপনার জন্য আমরা মার খাব।' আমি অগত্যা বিতাড়িত হয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি, রাজীব দেব একটা ট্যাক্সিতে উঠছে। আমি ওকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ওর ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। সেটা রাজভবনের গেটের কাছে এসে খারাপ হয়ে গেল। তখনই দেখলাম, পাশেই 'আমাদের ছেলে বোঝাই' পুলিশ ভ্যানটাও টায়ার পাংচার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুবোধ ছেলের মতো ট্যাক্সি থেকে পুলিশ ভ্যানে চলে গেলাম। রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?

তখন মাঝে মাঝে লিখতাম। আর বেশি লিখতাম, 'লিমেরিক'। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের নিয়ে লিখেছিলাম, যা কংগ্রেসের মুখপত্র 'নতুন বাংলো'য় ছেপেছিল।

'মন্ত্রীসভায় জ্যোতিবাবু নিলেন
পোষা ষণ্ডকে
গদি পেয়েই ষণ্ড গেল
হাঁক পাড়তে দণ্ডকে।
ডাক শুনে তার এল যারা
গুলি খেয়ে মরল তারা
চিনতে পেল নতুন করে বিপ্লবী এক ভণ্ডকে।'

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক কাহিনি

উত্তর তরাই

৩৭

ঝড়টা এল বেলা চারটে নাগাদ। সারাদিন প্রবল নিদাঘ। পাতা পর্যন্ত কাঁপছিল না। অনাদি চাটুজ্জে আড়ত বন্ধ করেন আড়াইটে-তিনটের দিকে। কাল রাতেও গরম ভালই ছিল। তিস্তা থেকে হাওয়া পর্যন্ত আসছিল না। অন্য দিন হলে গাছের ছায়ায় ঢাকা আড়তের ঠান্ডা ঘরে একটু ঝিমিয়ে নিতেন, কিন্তু আজ সকাল থেকেই এমন চড়া রোদ্দুর যে সেই ঘরও তেতে উঠেছে। তদুপরি চারদিকে এক ফোঁটা বাতাস নেই। অনাদি চাটুজ্জে অনুমান করেছিলেন যে ঝড়বৃষ্টি একটা কিছু হবে।

শহরে আবার উত্তেজনা বাড়ছে। যে কোনও সময় শুরু হয়ে যাবে কংগ্রেসের আন্দোলন। পুলিশের নজর তাই খুব কড়া। থানার দু'জন পেয়াদা সবসময় বাজারের কাছাকাছি মজুত থাকে। কংগ্রেস নেতাদের চোখে চোখে রাখার জন্য টাউনে নাকি গুপ্তচরও ঘুরছে। অনাদি চাটুজ্জের খুব গুপ্তচর দেখার সাধ। টাউনে কমবেশি সবাই সবাইকে চেনে। কদাচিৎ অপরিচিত মুখ দেখলে তাকে গুপ্তচর বলে ভাবতে মন্দ লাগে না তাঁর।

দিনবাজারের ব্যবসায়ীদের অনেকেই গোপনে কংগ্রেসকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে। হরি আগরওয়াল তাঁদের অন্যতম। তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন অনাদি চাটুজ্জেকে। আড়ত বন্ধ করে অনাদি স্থির করেছিলেন হরির গদিতে যাবেন। হরি আগরওয়ালের অনেক কারবার। দালানবাড়িতে গদি তাঁর। সেখানে পাঙ্খা পুলার আছে। এই গরমে সেখানে যাওয়াটাই ভাল। তা হরি আগরওয়ালকে দেখা গেল খোশমেজাজেই আছেন। তিনি অন্য দিকে ঠান্ডা শরবত খাইয়ে একটা নতুন জিনিস দেখালেন। কাচের শিশিতে ভরা তরল আলতা। সাত দিনের মধ্যে ডিস্ট্রিক্টে এই আলতা বেচতে শুরু করতে যাচ্ছেন।

মানতেই হবে, হরি আগরওয়াল খোঁজখবর রাখেন বটে। পাতা আলতার বাইরে আর কিছু যে হতে পারে, সেটা ভাবনাতেই আসেনি কোনও দিন অনাদির। ফলে কংগ্রেকে দেয় চাঁদার পরিমাণ নিয়ে আলোচনার বদলে হিল এলাকায় জাপানি জিনিস সাপ্লাই দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পেল সর্বাধিক। জাপান নাকি সস্তায় দারুণ সব জিনিস বানিয়ে পাঠাচ্ছে দেশের বাজারে। দেখতেও চকচকে। টি গার্ডেন আর হিল এলাকায় খুব চলবে। অনাদি হাজার দুয়েক টাকা জাপানি মালের ব্যবসায় লাগিলে দিলে কতটা বুদ্ধিমানের কাজ করবে, সেটা পরম উৎসাহে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন হরি আগরওয়াল। আলোচনা সেরে, ঠান্ডা হয়ে অনাদি চাটুজ্জে যখন

কাপড় পট্টির রাস্তা দিয়ে দিনবাজার থেকে বেরিয়ে লিচুতলার পথ ধরলেন, তখন হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

ঝড়টা তুমুল হল। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে ধুন্ধুমার বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক পর টাউনে প্রচুর চিহ্ন ছড়িয়ে দিয়ে প্রকৃতি শান্ত হতেই নরম রোদ্দুর এসে পড়ল ভাঙা মেঘের আড়াল থেকে। অনাদি চাটুজ্জের শীত করতে লাগল। তিনি বাড়িতে ফিরে কুয়োতলা থেকে পরিষ্কার হয়ে গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসলেন। সামনে গাছপালায় ঘেরা ছোট উঠোনের পর গলির রাস্তা। ওপারে সোনাউল্লার ইশকুলের পিছন দিকের বিরাট জলাজমি। পশ্চিমে বাঁশঝাড়ের আড়ালে চলে যাওয়া সূর্যের আলো লাল হয়ে জমে আছে মেঘের গায়ে। অনাদির বড় ছেলে সুকুমার সাইকেল নিয়ে সেই চমৎকার একটা সন্ধে উপভোগ করার জন্য বার হচ্ছিল। অনাদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

ছেলে পড়াশোনায় ভাল। জেলা স্কুলের সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে। অনাদির বড় অশা, ছেলে বড় অফিসার হবে।

'পঁচিশে বৈশাখ নিয়ে মিটিং আছে। আটটার মধ্যে চলে আসব।'

সুকুমার জবাব দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু অনাদি তাঁকে থামালেন। তারপর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পঁচিশে বৈশাখে কী হবে? পলিটিক্যাল কিছু করছিস না তো?'

'ধেত্তেরি!' সুকুমারকে বিরক্ত দেখায়, 'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।'

'রবীন্দ্রনাথ?'

'আরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! পোয়েট।'

অনাদি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রবিবাবুর জন্মদিন আবার পালন করার জিনিস হল?'

'আমরা ওঁকে টাউনে আসার জন্য চিঠি লিখব। গোকুলদাকে ড্রাফ্‌ট করতে দিয়েছি। তোমাকে কিন্তু মাইকের খরচ দিতে হবে। টাউনে কত গ্রেট গ্রেট লোক এসেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসেননি। আমরা তাঁকে আনব।'

'ওঁকে টাউনে আনার কিছু নেই।' অনাদি চাটুজ্জে নিস্পৃহ সুরে বললেন, 'আনার থাকলে আগেই আসত তোমাদের রবীন্দ্রনাথ। উনি গান-পদ্য লেখেন। মেয়েদের নিয়ে অ্যাক্টিং করেন। তোমরা আর্য নাট্যের স্টেজে ওঁকে দিয়ে যাত্রা করাবে?'

'যাত্রা কেন করবেন? স্পিচ দেবেন। দেখবে, লোক ভেঙে পড়বে।'

'উনি কি সি আর দাশ বা সুভাষ বোসের চাইতে ভাল স্পিচ দেবেন?' বক্তা রবীন্দ্রনাথকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন অনাদি চাটুজ্জে, 'শুনেছি বীরভূম না নদিয়ায় কোথায় শান্তি আশ্রম বানিয়েছেন। তা সেখানে একটু হাংগার স্ট্রাইকে বসতেও তো পারতেন। তোমরা ওঁকে জলপাইগুড়িতে অনশনে বসার প্রস্তাব দাও। রাজি হলে মাইকের খরচ দেওয়া যাবে।'

এই কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সুকুমার গটগট করে বেরিয়ে গেল। অনাদি চাটুজ্জে বারান্দা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি অন্দরমহলে গিয়ে বউকে খুঁজে বার করে বললেন, 'কী সব শুনছি আজকাল। রবিবাবুরও জন্মদিন পালন করবে সব!'

মালতীলতা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটছিলেন। বরের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'রমেশ এসেছিল আজকে।'

রমেশ হল মালতীলতার তুতো ভাই। সে মাথাভাঙায় থাকে। টাউনে এলে দেখা করে যায়। তার আসাটা নিতান্তই একটা খবর ভেবে অনাদি চাটুজ্জে পুনরায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা তুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মালতীলতা বলল, 'ওদের ওখানে তো ছি ছি পড়ে গিয়েছে!'

'কেন?'

'আরে, তোমাদের খুদিদার মেয়ে আর তাঁর জামাই। দু'জন নাকি প্রায় দিনই রাস্তায় বার হয়। খোলা গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। পরপুরুষের সামনে খুদিবাবুর মেয়ে নাকি গানও গেয়ে শোনায়।'

'বলো কী?' অনাদি চাটুজ্জে উৎফুল্ল হলেন। এসব খবরে তাঁর ভারী আমোদ। 'এসব তো বেম্মরা করে। খুদিদার জামাই বেম্ম নাকি?'

মালতীলতা আরও একটা সুপুরি জাঁতির ফাঁকে বসিয়ে বললেন, 'হতে আর বোধহয় বাকি নেই। রমেশ তো বলল, সে মেয়ে নাকি জ্যোৎস্না রাতে ছাদে বসে বরকে রবিবাবুর গান গেয়ে শোনায়। অবশ্য বরকে শোনালে খারাপ কিছু নেই। তবে ছাদে বসে শোনানোটা বাপু বাড়াবাড়ি।'

'ছাদ কেন? গোটাটাই একটা বাড়াবাড়ি!' রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ফিরে আসতেই অনাদি চাটুজ্জে উজ্জীবিত স্বরে গর্জে উঠলেন, 'তুমি একবার সুকুর খাতাপত্র চেক করে দেখো তো। কবিতা লেখা শুরু করেছে কি না জানা দরকার। তলে তলে সে রবি ঠাকুরকে টাউনে আনার মতলব আঁটছে।'

মালতীলতা অবশ্য বিচলিত হলেন না। সুপুরি কাটায় মন দিয়ে বললেন, 'রবি ঠাকুরকে আনবে বলেছে নাকি? শুনেছি উনি নাকি পড়াশোনায় খুব ভাল। বি.এ. পাস, তা-ই না?'

রবি ঠাকুরের শিক্ষাগত যোগ্যতা না জানা থাকায় অনাদি চাটুজ্জে একটু থমকে গেলেন। বঙ্কিম চাটুজ্জে ডেপুটি ছিলেন, রবি ঠাকুর নিশ্চয়ই সিভিল সার্ভিস পাশ করে থাকবেন! কিন্তু সুকুমার কি কবিতা লিখবে আর আর্য নাট্যের স্টেজে নেচে বেড়াবে? বাবা হিসেবে এটা কিছুতেই ভাবতে পর্যন্ত পারছেন না তিনি। তাই পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ঘোষণা করলেন, 'খুব বেশি পড়াশোনা করেননি রবি ঠাকুর। যদ্দুর শুনেছি ম্যাট্রিকটা উতরেছেন। কবিতা পড়ে অবশ্য সেটাই বিশ্বাস হয়। সুকুর খাতা চেক করা দরকার, বুঝলে? খাতায় কবিতা পেলে আমায় বলবে। ব্যাপারটা সিরিয়াস!'

'খাতা দেখে কী হবে!' মালতীলতা হাসিমুখে বললেন, 'কবিতা তো ও লেখেই। আমাকে তো শুনিয়েছে। ভাদু তো রোজ শোনে।'

অনাদির ছোট ছেলে ভাদু ফোর্থ ক্লাসে পড়ে। পাশের ঘর থেকে সে জানিয়ে দেয় যে কথাটা সত্যি।

'সুকুর কবিতা তুমি শুনেছ!' অনাদির বিস্ময় পর্বতপ্রমাণ হয়ে গেল, 'নিজের লেখা?'

'তা-ই তো বলে।'

'রবি ঠাকুরের মতো?' অনাদি ঘাবড়ে যান।

'রবি ঠাকুরের কবিতা তো আমি পড়িনি। তা ছাড়া সুকু ইংরেজিতে লেখে। সে কবিতা আমি কী করে বুঝব?' মালতীলতা আরও একটা সুপুরি তুলে নিয়ে জানান।

অনাদির বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে যায়। তিনি স্ত্রীর পাশে বসে আপ্লুত গলায় বলতে থাকেন, 'বলো কী? ইংরেজিতে লেখে? তার মানে কবিতা নয়, পোয়েট্রি। আমার মনে হয়, সুকু বিলেত যাবে।'

সাজানো-গোছানো সুন্দর ছোট্ট টাউনে তখন ভারী চমৎকার রাত্রি নামছে। গ্রীষ্মের তাপদাহের লেশমাত্র তখন বাতাসে নেই। কোথাও ঢাক বাজছিল। ভেসে আসছিল হালকা উলুধ্বনি। অনাদি চাটুজ্জের হৃদয় সেই ক্ষণে পরম আনন্দে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছিল যেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান যে বড়ই প্রতিভাবান, সে বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিন্দুমাত্র দ্বিমত হচ্ছিল না। সেকেন্ড ক্লাসে পড়তেই যে ইংরেজিতে পোয়েট্রি লিখতে পারে, সে কালে কালে যে ইংরেজিতে দিগ্‌গজ হয়ে উঠবে না, তার কী মানে? ধরো, রবি ঠাকুর এল। তাঁকে দেখতে কি লোকজন আসবে না আর্য নাট্যে? তখন দশটা লোকের সামনে সুকু মাইকে ইংরেজি পোয়েট্রি পড়বে, আর লোক যখন জানবে সে পোয়েট্রি স্বরচিত, তখন যে ক্ল্যাপটা পড়বে তা যেন মানসকর্ণে শুনতে পারছিলেন অনাদি।

এই অবস্থায় মাইকের টাকা তো একশোবার দিতে হবে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্সে বড়দিন নিজেকে নম্র করার দিন

ডিসেম্বরের পাঁচিশ হল যিশুর জন্মদিন। আমরা বলি বড়দিন। ইউরোপের লোকেরা বলে ক্রিসমাস বা এক্স-মাস। Cristes maesse কথা থেকে ক্রিসমাস, যার অর্থ হল Mass of Christ, খ্রিস্টের পূজার্চনা। বড়দিন খ্রিস্টানদের আনন্দোৎসব। কিন্তু এই দিনটিই বড়দিন কেন? রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন, আসুন একবার শুনে নিই— 'যে দিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যে দিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেই দিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দিনই বড়দিন, তা সে যে তারিখেই আসুক।'

সেই পুরনো গল্পটা আমাদের বহুবার শোনা। প্রাচ্যের তিন জ্ঞানী পুরুষ রাতের আকাশে একটি চলমান নক্ষত্র দেখতে পান। কৌতূহলী হয়ে নক্ষত্রটিকে অনুসরণ করে বেথলহেমে এক গরিব মেষপালকের গোশালায় এসে পড়েন তাঁরা। নক্ষত্রের উজ্জ্বল আলোয় তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পান, ভগবান যিশুর আবির্ভাব ঘটছে ধরাধামে। বড়দিনের এক মধুর অনুষঙ্গ হল ক্রিসমাস ক্যারল। ক্যারল গান আসলে এক আনন্দগীতি, যার মধ্যে দিয়ে বড়দিনে যিশুর আগমনবার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরে ক্রিসমাসের সূচনা হয় ১৯১০ সালে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আজ পরিতাপ করার দিন, আনন্দ করার দিন নয়, আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধুলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়দিন নিজেকে পরীক্ষা করার দিন, নিজেকে নম্র করার দিন।'

বড়দিনের যে ধর্মীয় দিক রয়েছে তা হল, চব্বিশে ডিসেম্বরের মধ্যরাতে ক্রিসমাস ইভের সমবেত প্রার্থনা, গির্জায় গির্জায় ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে দিয়ে শুরু আরাধনা। ক্রিসমাস উৎসবের পরিচিতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে। রোমানদের কাছে এটা যেমন 'স্যাটারনালিয়া', স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় তেমনি 'ইউল ফিস্ট'। ইংল্যান্ডে সেটাই আবার 'লর্ড অব মিসরুল'। কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল বা গোয়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত দু'-একটি চার্চে বড়দিনের সন্ধে কাটাবার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সেই বর্ণময় উৎসবের সঙ্গে প্রান্তিক ডুয়ার্সের বড়দিন যাপনের কোনও তুলনা টানা যায় না। তবে বৈভব নয়, উৎসবের মূল কথা যদি হয় একজন মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে অসংখ্য মানুষের যোগ তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ডুয়ার্সও বড়দিন পালনে পিছিয়ে নেই। প্রত্যন্ত ডুয়ার্সের গির্জায় গির্জায় বড়দিন যাপিত হয় নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব রীতিতে, নিজস্ব ঢঙে।

এই বিশেষ দিনটি সবুজে ঘেরা ডুয়ার্সে কীভাবে যাপিত হয়, সেটা নিজের চোখে দেখার জন্য মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটা, বানারহাটের আনাচকানাচে টুঁ মেরেছিলাম গত বছর। ফিনফিনে জরির মতো নদীর তীরে, আকাশে হেলান দেওয়া পাহাড়ের টঙে, সবুজ চা-বাগানের আঁচল ছুঁয়ে যেসব অখ্যাত গির্জা ছড়িয়ে রয়েছে, সেসব জায়গায় চরে বেড়িয়েছিলাম। সকাল থেকে সন্ধে ঘুরে দেখেছি, এই বিশেষ দিনটিতে ডুয়ার্সের মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস কেমন অনন্য মাত্রা পায়। অন্য ধর্মের মানুষের যোগদানে সেই উৎসব কী আশ্চর্য মন্ত্রে হয়ে ওঠে সর্বজনীন।

জলপাইগুড়ির সায়নি চন্দ, ফোটোগ্রাফিকে শিল্পে উত্তীর্ণ করার সুবাদে যাঁর নামডাক, গতবার বড়দিনের উদ্‌বেল সন্ধ্যায় তুরীয় মাত্রা যোগ করেছিলেন রংবেরঙের ফানুস উড়িয়ে। জলপাইগুড়ির বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে উড়েছিল অসংখ্য রঙিন ফানুস।

সেই বর্ণিল আলো আর আশ্বাস ছুঁয়ে গতবার ডুয়ার্সে নেমে এসেছিল ক্রিসমাসের রাত। সে দিন সায়নির সঙ্গে কথা হল। বিষাদবিধুর সায়নি জানাল, এবার বড়দিনে ফানুস উৎসব করে উঠতে পারবে কি না, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। সমস্যা অর্থের, সমস্যা লোকবলের। একা একা আর পেরে উঠছে না বেচারি। সায়নির বিষাদ ছুঁয়ে গেল আমাকেও।

মনটা আরও মেদুর হল লাইব্রেরিয়ান মানস ভট্টাচার্যর সঙ্গে কথা বলে। আটের দশকের শুরুতে আজাদ হিন্দ পাঠাগারের যখন সদস্য হয়েছিলাম, তখন আমি হাফপ্যান্ট পরা স্কুল ছাত্র। কালো চুলের রোগাটে গড়নের সৌম্যদর্শন মানসদা তখন নব্যযুবা। গত সাড়ে তিন দশক জুড়ে আনাগোনা করায় খুব কাছ থেকে দেখেছি মানসদাকে। যে পরম যত্নে মানসদা এতদিন এই পাঠাগারটির রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, সেই মমত্ব আমরা আমাদের নিজেদের বাড়িকেও দেখাই না। তিনতলা লাইব্রেরিটির দুটো ফ্লোর বইয়ের আলমারিতে ভরতি। কিন্তু মস্তিষ্কের ধূসর কোষের মধ্যে কোথাও একটা অদৃশ্য ম্যাপ রয়েছে মানসদার। কেউ বিশেষ একটা বইয়ের খোঁজ করলে, সেই বই যদি লাইব্রেরিতে থাকে, অন্বিষ্ট বইটি কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর সামনে এনে হাজির করে দেবেন এই ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক!

জানুয়ারি মাসে চাকরি থেকে অবসর নেবেন মানসদা। অবসান হবে একটি অধ্যায়ের। এর পর এই পাঠাগারের ভার যিনি নেবেন, তিনি কি এভাবেই যত্ন করবেন? মানসদার সঙ্গে অনেক গল্প হল সে দিন। ক্ষোভ দেখিয়ে বললেন, মানুষের বই পড়ার অভ্যাস একেবারে কমে গিয়েছে। আটের দশকের শুরুতে প্রতিদিন গড়ে একশোরও বেশি সদস্য আসতেন বই বদলাতে। সংলগ্ন রিডিং রুমে রাখা হত থরে থরে ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্র। খবরের কাগজ পড়ার জন্য দুপুর থেকে ভিড় জমাতেন অজস্র পাঠক। এখন লাইব্রেরিতে বই বদলাতে প্রতিদিন আসেন মেরেকেটে দশজন সদস্য। সংলগ্ন রিডিং রুমে লোকই হয় না। ভাঁজ করা খবরের কাগজগুলোর ইস্ত্রি দিনের শেষেও অটুট থাকে। পাতা উলটেও দেখেন না কেউ।

নতুন প্রজন্ম বইবিমুখ। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, টিভির অসংখ্য চ্যানেলের প্রলোভন জয় করে মানুষ আর সেভাবে বই পড়ছে না। কিনছেও না। সুনীল, শীর্ষেন্দু, বুদ্ধদেব, সমরেশ, সুচিত্রার পরে যাঁরা লিখতে এসেছেন, সেই নতুন লেখকদের বই পড়া তো দূরের কথা, তাঁদের অধিকাংশের নাম অবধি জানে না জেন-ওয়াই পাঠক। শুধু পাঠককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বইমেলার সময় গ্রন্থাগারিকরা যখন সরকারি অনুদানের টাকা দিয়ে স্টলে স্টলে ঘুরে নিজের পাঠাগারের জন্য বই কেনেন, তখন তাঁদের অধিকাংশই নতুন লেখকদের বই ছুঁয়েও দেখেন না। ফলে শহর তো বটেই, গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা বিরাট সংখ্যক পাঠকের কাছে নতুন লেখক পৌঁছাতে পারেন না। বাংলা সাহিত্যের এই যখন হাল, একজন প্রকাশক তাহলে কী করে উৎসাহ পাবেন বাংলা প্রকাশনায় পুঁজি লগ্নি করতে!

বাংলা প্রকাশনা শিল্পের এই হতশ্রী দশার মধ্যেও 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রকাশক আমার দু'টি বই সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি হল পঁচিশটি গল্পের একটি সংকলন 'লাল ডায়েরি'। দ্বিতীয়টি একটি উপন্যাস 'বসন্তপথ'। 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকাতে 'বসন্তপথ' ধারাবাহিক আকারে যখন বেরত, সে সময় কারও কারও মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। অনেকে এই কাহিনির চরিত্রদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছেন এবং তাঁদের মতামত জানিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। আখ্যানটি যে অন্তত কিছু পাঠককে ছুঁয়ে গিয়েছে, সেটা জেনে তৃপ্তি পেয়েছি। এবার সেই উপন্যাসটি মলাটবন্দি হল। বইটির জন্য দৃষ্টিনন্দন একটি প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন যশস্বী শিল্পী দেবাশিস সাহা। পাঠক 'বসন্তপথ' উপন্যাসটিকে স্বাগত জানান কি না, সেটাই এখন দেখার।

সাহিত্য হল সমাজের আয়না। কিন্তু কোনও ঘটনা বা গল্প থাকলেই তা সাহিত্য হয় না। কোনও ঘটনার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব জীবনদর্শন মিশে গেলে তখন তা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের চেতনে বা অবচেতনে মিশে যাচ্ছে দৈনন্দিন প্রতিটি মুহূর্ত। সামাজিক নানা ঘটনার অভিঘাত জারিত হচ্ছে আমাদের সমগ্র সত্তায়। লেখক চেষ্টা করেন সেটা নিয়ে আসতে তাঁর লেখায়। বছর দশেক হল আমার লেখালেখির বয়স। গত এক দশকে আর পাঁচজন লেখকের মতো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখাতেও পটপরিবর্তন ঘটেছে, বদলেছে আঙ্গিকের রীতিপ্রকৃতি, বিষয়বৈচিত্রে এসেছে বিস্তৃতি। আমার প্রথম বই 'চংক্রমণ' প্রকাশিত হয়েছিল দু'বছর আগে। 'লাল ডায়েরি' আমার দ্বিতীয় গল্পসংকলন। এই বইটিরও ভারী সুন্দর একটি প্রচ্ছদ এঁকে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন বন্ধুবর দেবাশিস সাহা। এই বইটিতে স্থান পেয়েছে গত তিন-চার বছরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখা থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের নিরিখে বেছে নেওয়া পঁচিশটি ছোটগল্প। আমি আশাবাদী, আমার সৃষ্টির এই বাঁক ও পালাবদলকে পাঠক নিশ্চয়ই বরণ করে নেবেন।

দু'বছর আগে কলকাতা বইমেলায় একটি প্রকাশনা সংস্থার স্টলে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ইমদাদুলভাই চমৎকার মানুষ। শক্তিশালী লেখক, জনপ্রিয় কথাশিল্পী, একই সঙ্গে অমায়িক ভদ্রলোক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কালের কণ্ঠ' নামে একটি সংবাদপত্রের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের জনপ্রিয়তা নিয়ে। তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, বাংলাদেশে সামগ্রিক ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে নতুন প্রজন্ম লিটল ম্যাগ নিয়ে মেতে থাকে আজও। বইবিলাসী মানুষ প্রচুর বই পড়েন, বই কেনেনও। হুমায়ূন আহমেদের বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায় এক বইমেলাতে। সেলিনা হোসেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো সাহিত্যিকদের খ্যাতি সেখানে তুঙ্গস্পর্শী। কবিতাও ভালবাসেন মানুষ। অশীতিপর নির্মলেন্দু গুণ যাকে বলে 'লিভিং লেজেন্ড'। এই প্রজন্মের ওবায়েদ আকাশও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অল্প বয়সেই। সে দিন ইমদাদুলভাইয়ের কথা শুনে বড় একটা শ্বাস গোপন করেছিলাম। পাশাপাশি দুটো দেশ। কাঁটাতারের বেড়ার দু'দিকের মানুষের মাতৃভাষা একটাই, বাংলা। অথচ দু'জায়গার বাঙালি পাঠকের মনের মানচিত্র এমন বিপ্রতীপধর্মী কী করে হয় কে জানে!

এদিকে সম্প্রতি পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট, যা কিনা দেশের মোট কারেন্সির প্রায় ছিয়াশি শতাংশ, ভারত সরকার আচমকা বাতিল করে দেওয়ায় দেশ জুড়ে সব ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এককালীন টাকা তোলার ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে রেশনিং ব্যবস্থা। নিজেকে বঞ্চিত করে জমা করা কষ্টার্জিত টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে ও এটিএম-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে লাইন দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। টাকার জোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় জীবনদায়ী ওষুধ পর্যন্ত কিনতে পারছে না মানুষ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও কিনতে হচ্ছে অনেক হিসেব করে। সেই আঁচ এসে পড়েছে প্রকাশনা ব্যবসাতেও। শিলিগুড়িতে আয়োজিত উত্তরবঙ্গ বইমেলায় দেখা গিয়েছে সেই ছবি। সেখানে এবার মানুষ অন্য বছরের মতো হইহই করে আসেনি। যদিও বা এসেছে, গাঁটের স্বল্প কড়ি প্রাণে ধরে খরচ করে বই কিনতে পারেনি। আগামী ১৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা। তারপর এক-এক করে ডুয়ার্সের অন্যান্য জনপদেও বইমেলা বসবে। পরিবর্তিত ব্যবস্থার সঙ্গে যোঝবার জন্য অনেক প্রকাশক ক্রেতাদের সুবিধার্থে ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছেন সোয়াইপ যন্ত্র, যাতে প্লাস্টিক কার্ডে বিকিকিনি করা যায়। এমতাবস্থায়, আশা করা যাক, আগামী এক মাসের মধ্যে টাকার জোগান খানিকটা হলেও স্বাভাবিক হবে, এবং মানুষ বইমেলায় এসে নিজের পছন্দমতো বই কিনতে পারবে।

এক যে ছিল ঘাসঅলা

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

সাগরিকা রায়

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ডুয়ার্স। ১৯৭১-এর কথা। স্বাধীন দেশ গঠনের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ পাকিস্তানি সেনার সম্মুখীন। সমস্ত দেশ জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা। সে সময় বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ সেক্টরের রংপুরে ছিল আবদুল মতীনের বাড়ি। বাড়ি না বলে ঠেক বলাই উচিত। দেশ জুড়ে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় সেই ঠেক বড়ই নড়বড়ে। পড়শিরা পালিয়ে যাচ্ছে বন্ধু-দেশ ইন্ডিয়ায়। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। আবদুল কেন অকারণে প্রাণটা খোয়াবে? বিশেষত তার বিবি আছে। রয়েছে ছয়টি ছেলেমেয়ে। এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালাও। তবুও, ভাবলেই হয় না পরিচিত মাটি থেকে পা তুলে নেওয়া। কিন্তু এরই মধ্যে হয়ে গেল এক ভয়ংকর ঘটনা। ১৯ মার্চ পাক-সেনারা জয়দেবপুরে কুড়িজনকে গুলি করে হত্যা করে। এর পর শুরু হল দাঙ্গা। মতীন আর অপেক্ষা করার সাহস পেল না। রংপুর থেকে সোজা ডুয়ার্সে পা বাড়াল। নিতান্তই খেটে খাওয়া মানুষ। না বোঝে রাজা, না বোঝে রাজনীতি। কেবল বোঝে আপনজনদের আর প্রাণটুকু রক্ষা করতে। রাতের অন্ধকারে পালাল মতীন। বিবির সঙ্গে সারাজীবনই দাম্পত্য কলহ চলেছে। এখন বড় অসহায়। সন্তানদের সঙ্গে করে, বিবির হাত ধরে দেশ ছাড়ল মতীন। চ্যাংরাবান্ধা হয়ে মাথাভাঙা। তারপর আলিপুরদুয়ার। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে ভীতসন্ত্রস্ত মতীন পরিবার নিয়ে টালমাটাল অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তবু বসন্তের কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, জ্যাকারান্ডা, বাঁদর লাঠির রূপে মতীন কিছুটা শান্ত হল। এখানে পা রাখার জায়গা পাওয়া যাবে। জঙ্গল, নদী, পাহাড়— কেউ তো তাড়িয়ে দিচ্ছে না। কেউ ভয় দেখাচ্ছে না! দূরে দেখা যায় বিরাট আশ্বাসের মতো ভুটান পাহাড়। আস্তানা গাড়তে সময় লাগল। শেষ পর্যন্ত মাদারিহাটের চালায় অস্থায়ী বসবাসের একটা জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে তারা একা নয়, আরও পরিবার আছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষকে এখন একত্রে সহাবস্থান করতে হচ্ছে। কিন্তু জীবন চলবে কী করে? পাশের চালার সদ্য-চেনা পড়শি জানতে চায়, তুমি কী কাজ জানো?

—কাজ? মুনিশ খাটি জমিতে।

—জমি? এইখানে জমি পাবা কোথায়?

—তাইলে? কাজ না পাইলে বইসা বইসা ঘাস কাটব?

—ঘাস? তা কাটতে পারো। ঘাস এহানে ভাল বিকিরি হয়। গোরুর জন্য ঘাস কেনে বাবুরা। আমার চাচা এই কাজ করে।

ঘাস কাটবে আবদুল মতীন? বিবি কী বলে দেখা যাক।

বিবি শুনে রাজি। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তা ছাড়া সদ্য-চেনা পড়শির চাচা যখন এই কাজ করে, তখন তার একটা অভিজ্ঞতা আছে। শলা তার থেকে নেওয়া দরকার।

বুদ্ধি দান করার ব্যাপারে মানুষ বড্ড উৎসাহী। সুতরাং মতীনের চারপাশে সাহায্যকারী দাঁড়িয়ে পড়ল অনেকে।

—চলে যাও চা-বাগানে। এখানে যদ্দূর দেখবে, সব চা-পাতার কারবার। চা-বাগান ভরা ঘাস। নরম সবুজ তকতকে। কিনতেও হবে না। নিয়ে এসো।

দিন দুই একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তিন দিন পরে সব সড়গড় হয়ে গেল। হপ্তা গেলে হাতে কড়কড়ে টাকা আসছে। মতীনের মুখের চামড়া থেকে দুশ্চিন্তার ভার একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে। এসব ব্যাপারস্যাপার দেখে বিবি বায়না ধরল, সে-ও যাবে ঘাস আনতে। সিরাজুলের বুবু, জব্বরের আম্মু সব যাচ্ছে কাজ করতে। বিবিকে লুকিয়ে রাখলে কি পেট চলবে? ছাওয়াদের খোয়া দিবার নাগবো না? মতীন ভাবে, বিবি কাজে গেলে খাবার বানাবে কে? ঘাস কেটে ফিরে এসে ছান করে খেতে বসার যে কী আনন্দ!

মতীন আসবে বলে বিবি ভাত রানবেন, বাগুন ভাজবেন, টাহি মাছ দিয়া উস্তার তরকারি রানবেন, তেঁতুলির টক বানাবেন। তো বিবি কাজে গেলে এসব কী করে হবে?

মতীন রেগে গেল। তার কামাইতে বিবির পেট ভরে না? ফের সেই কলহ। শেষে বিবির জয়। সে নেমে পড়ল কাজে। কাজ বলতে ঘাস কেটে আনা। এনে বিক্রি করা। এভাবে বেশ চলছিল। বিবি এক বাড়িতে নিয়মিত ঘাস দেওয়ার কাজ পেয়েছে। হপ্তা গেলে তার হাতেও আসছে কিছু। এর মধ্যে হল এক কাণ্ড। বৃষ্টিতে ভিজে বিবির এল জ্বর। তিন দিন ঘাস আনতে যেতে পারেনি। কিন্তু বাড়িতে গোরুবাছুর আছে যাদের, তাদের ঘাস চাই। কেউ একজন ঘাস বেচতে এসেছে, ঘা...স... নি...বা...! বাড়ির গিন্নি ডেকে নিলেন। ঘাস ভাল, পরিমাণেও বেশি। যে বউটি ঘাস দেয়, বলা-কওয়া নেই, আসছে না। তাহলে এই লোকটার থেকেই ঘাস নেওয়া যাক এখন থেকে। ঘাসঅলা বহাল হল। গিন্নি সাবধান করেন— দেখ, ঠিকঠাক না এলে কিন্তু অন্য লোক দেখে নেব।

ঘাড় কাত করে ঘাসঅলা— দিব আম্মা।

সে চলে যাওয়ার ঘণ্টা দুই পরে মতীনের বিবি এসে হাজির। আজ শরীর ভাল বোধ হচ্ছে। তাই...! কিন্তু অঘটন ঘটে গিয়েছে। বাড়ির গিন্নি মাথা নাড়েন— না গো, তুমি আসছ না বলে একটি লোকের থেকে ঘাস নিয়েছি। এখন থেকে সে-ই দেবে।

অন্য একজন? মতীনের বিবি ভাবনায় পড়ে গেল। এই রুটে একমাত্র মতীনই যাতায়াত করে।

—কীরকম দ্যাখতে তারে আম্মা? বলে সে নিজেই লোকটার চেহারার বর্ণনা দেয়— শিটিঙ্গা করি? কালা করি? বড্ড বড্ড দাঁন্ত? এরম এরম হাঁটে? দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে, পেট উঁচিয়ে, পা দুটো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অদ্ভুতভাবে হেঁটে দেখাল সে।

গিন্নি চিন্তায় পড়েন— অত কি দেখেছি? তবে মনে হচ্ছে যেন এইরকমই।

—অগ আম্মা! মতীনের বউ আঁতকে ওঠে— ওইটাই তো আমার মরদ! আইজ উয়ারে গিয়া ডাঙ্গামু। তীব্র গতিতে সে হাঁটতে থাকে হাটখোলার উদ্দেশে। কী হবে কে জানে! গিন্নির চোখে চিন্তা। মারপিট করে ঘাস দেওয়া বন্ধ না করে!

দিল অবশ্য। পরদিন বেলা একটা নাগাদ এক গাল হেসে ঘাসঅলা এল ঘাস নিয়ে। বোঝা নামাল মাথা থেকে। পুরনো গামছা ঘুরিয়ে গা মুছে হাসে— দ্যাখলা আমার বিবিরে?

—সে তোমার বিবি? কাল খুব ঝগড়া করেছে?

কী আর হবে! ধমক দিতেই নাকি বিবি কাত।

—ধমক? পারো দিতে? গিন্নির চোখে সন্দেহ।

—দ্যাখবা একদিন। আমারে খুব ডর খায়। মতীনের গোল মুখে চলকে ওঠে পৌরুষ— মোরা একসাথে থাকি না।

—কেন?

—ও বড় কাজিয়া করে। মতীন দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে। স্বাভাবিক। যার বউ সর্বদা কাজিয়া করে, তার দশাটা মতীনকে দেখেই বোঝা যায়। তবে গিন্নিমাকে সে খুব ভক্তি করত। এ বাড়ির কাজ সে ছাড়েনি। আসে। বোঝা রেখে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খায়। কখনও টিউবওয়েল পাম্প করে তেষ্টা মেটায়। মাঝে এসে কখনও বিবি মতীনের নিন্দেমন্দ করে। ছেলেপুলেকে দেখে না মতীন। মতীন আবার উলটো গীত গায়। সে তো মিলেমিশে থাকতেই চেয়েছিল। কিন্তু বিবি বড্ড কটু।

সেবার প্রবল শীতে কাঁপছে ডুয়ার্স। ঘরের মেঝেতে পা ফেলা যাচ্ছে না। বরফ হয়ে আছে সব। গাছপালা জড়বৎ। মোটা মোটা শিশির পড়ে থাকে গাছের পাতায়, ঘাসে। সাড়ে আটটার আগে সকাল হয় না। মতীন একদিন এল ঘাস নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে। একটা পুরনো লুঙ্গির টুকরো গায়ে জড়ানো। গিন্নিমা দেখে-শুনে একটা রংচটা সোয়েটার বার করে দিলেন। একখানা কম্বলও। মতীন সেগুলো হাতে নিয়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কখন সে চলে গিয়েছে, কেউ খেয়াল করেনি। পরদিন সে এল সোয়েটার পরে। এসেই গিন্নিকে সালাম।

—কর্তা অবাক, কী হল? আজ এত ভক্তি?

—হবে না? আম্মা মোরে ঢুসা দিছে।

মতীন কম্বলের কথা বলছিল। সাধারণত ঢিস বা ঢুসা দেওয়ার কাজটা তো গোরু-মোষেই করে থাকে। গিন্নি সেই কাজ করেছে শুনে রসিক কর্তার হাসি থামে না।

শীতের শেষাগোসা মতীনের শরীর ভেঙে পড়ল। এসে থুম মেরে বসে থাকত। ইদানীং নিয়মিত ঘাস দিতে পারছিল না। বিবিকে ফের বহাল করতে হল। এ নিয়ে বিবি বেশ চকম চকম কথা শোনালেও মতীন জবাব দিত না। শুনে যেত। ডাক্তার দেখানোর কথা বললেও শুনত না বলে গিন্নিমার উদ্যোগে ডাক্তার দেখানো হল। কিছু খেতে পারছে না। হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ। অনেক দিনের কথা। তখন ডুয়ার্সের মানুষ হুট বলতে ভেলোর যেত না। জলপাইগুড়ি যাওয়াই বিশাল ব্যাপার তখন। এক রবিবার মতীন এল ধুঁকতে ধুঁকতে। সেই প্রথম, সেই শেষবার আম্মার কাছে খেতে চাইল— তোমার রান্দা ভাত খাব আম্মা। অভিজ্ঞতার আঁচে কিছু বুঝতে পেরেছিলেন গিন্নি। ভারাক্রান্ত মুখে মতীনকে খেতে দিলেন।

মতীন ভাত নাড়াচাড়া করল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়াল— ধানের চালের ভাত তিতা লাগে আম্মা! আমি আর না বাঁচিম। ধুঁকে ধুঁকে চলে গেল সে। পড়ে রইল তার জন্য বেড়ে রাখা ভাত।

পরদিন বিবি এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার চরিত্রের এহেন বৈপরীত্যে অবাক গিন্নিমা— তোমার মরদের শরীর কেমন আছে? কাল কিছুই খেতে পারল না!

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মতীনের বিবি— বাঁচবে না আম্মা! ছালাটা শুয়া পড়ছে। মানে হল মতীন শয্যা নিয়েছে। চোখ মুছতে মুছতে তাকাল বিবি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সম্পর্ক তেতো ঠিকই, ছিন্ন তো হয়ে যায়নি!

—ওইটারে মোর কাছে নিয়া আচ্চি। একলা কেমন করি থাকে কন আম্মা! চলে যাচ্ছে মতীনের বিবি। বলে গেল, কাল যদি সব ঠিক থাকে, তবে সে ঘাস নিয়ে আসবে। না হলে কাল সে আর...!

পরদিন এল না বিবি। তবে কি মতীন...? না, সে এখনও বেঁচে। তবে অবস্থা ভাল নয়। পরদিন বিবি এল না। সকালেই সে আসে বরাবর। মতীন তাহলে চলে গিয়েছে! বিবি এল সময় পার করে দুপুর তিনটে নাগাদ। ঘাসের বোঝা নামিয়ে দাঁড়াল।

—কী হল? মতীন...?

—আচে আম্মা, এখনও আচে। বাঁচি আচে মোর মরদটা।

—তোমার এত দেরি হল আসতে?

—আর মা! কী কইম! মরদটার এমুন দশা হইল, ভাবছি, গেল মরদ! আল্লাহ নিয়া নিল। ইছা (চিংড়ি) মাছ আনছিলাম। রান্দা করছি। এমুন সময় মরদটা হাঁকপাক করি নিক্কাস ফেলছং। যদি মরি যায়, রান্দা সব ফেলতি হবে। কতয় পয়ছা নষ্ট। বাচ্ছাগুলান কতদিন বলছেং ইছা খাবার জন্যি। রাইত হয়া গেল। সব খাবা সারি নিদ গেচে। ছুবের (সকাল) জন্য মাছ ভাত দিল। কাজে যাবার আগে খাবা নাগবে। কিন্তু বাপটা মরলি তো সব ফেল্যা দিবার নাগে। বাচ্ছাগিলার নিদ থিকা উঠাইছি। ভাত-মাছ ফের খাবা দিলাম। আইজ ছকাল থিকা দশবার দিখতিছি এই ছালা তো মরে না। কাজে না গেলি পয়ছা পাব না। বহুত ছময় দাড়ায় থাকি ঘাস আনতে যেছু। এখুন যাই। কেমন আচে মরদটা...

দারিদ্রের সেই ভয়ংকর চেহারা মতীনের বিবির পিছুপিছু রওনা দিল। হয়ত তার মরদটা মরে গিয়েছে। একা, নিঃসহায় একটি মানুষ শূন্য দেশের মাটিতে একটা চালাঘরের নিচে মরে পড়ে রয়েছে! কিছু করার ছিল না। বাচ্চাদের পেট ভরাতে তার বিবিকে কাজে বার হতে হয়েছিল। ঘটনা খুব সামান্য। গল্প লেখার মতো নয়।

স্কেচ: দেবরাজ কর

বই পত্রের ডুয়ার্স

দরকার ছিল এই অনুবাদের

গবেষকরা নিশ্চিত যে জোসেফ ডালটন হুকার হলেন প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞানী, যিনি পূর্ব হিমালয়ের উদ্ভিদকুল সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তালিকা রচনা করেছিলেন। হুকার সাহেবের প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘ফ্লোরা অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া’ ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ছিল প্রায় সাত হাজার উদ্ভিদের পরিচয়। ‘হিমালয় জার্নালস’-এর রচয়িতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে, এবং কার্যকারণসূত্রে তাঁর সঙ্গে জলপাইগুড়ির প্রথম পর্বের ইতিহাসের অংশও জড়িয়ে গিয়েছে। উক্ত জার্নালস-এর একটি অংশে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন জলপাইগুড়ির কথা। রায়কত রাজাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি এবং প্রাণীতত্ত্ববিদ ব্রায়ান হটন জনসন ১৮৪৭ সালের ১ মার্চ থেকে এক পক্ষকাল জলপাইগুড়িতে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত রাজাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলমহলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। জার্নাল থেকে এই অংশের অনুবাদ করেছেন উমেশ শর্মা।

ক্ষুদ্র গ্রন্থটি দু’টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে হুকার সাহেবের জার্নালের অনুবাদ এবং পরের অংশটিতে অনুবাদকের ভ্রমণাভিজ্ঞতা। জলপাইগুড়ি থেকে হুকার যে পথে জঙ্গলমহল পরিদর্শন করেছিলেন, সে পথেই ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। এই ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছিল ২০০৫ সালে। হুকারের ভ্রমণের ১৫৭ বছর পর।

দু’বার রাজধানী বদল করার পর ১৮০০ সালে বর্তমান জলপাইগুড়ি শহরে বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। হুকার সাহেবের আগমনকালেও জলপাইগুড়ি শহরের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে। জলপাইগুড়ি জেলাও গঠিত হয়নি। রাজাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের দায় থাকলে হুকার সাহেব আসতেনও না। বিজ্ঞানী হলেও তিনি যুদ্ধ করতেও জানতেন। সিকিমের বিরুদ্ধে তিনি সেনা অভিযানও চালিয়েছিলেন। তাই সর্বদেব রায়কতের মৃত্যুর পর কে রাজা হবেন, সে বিষয়ে জটিলতা দূর করার জন্য কোম্পানি তাঁকে নির্বাচন করেছিল। তা ছাড়া হুকার সাহেব তখন দার্জিলিঙে ছিলেন। ঘটনাচক্রে জলপাইগুড়িতে কাটিয়ে যাওয়া কয়েকটা দিনের অভিজ্ঞতা জার্নালে স্থান পাওয়াটা জলপাইগুড়ির ইতিহাসের পক্ষে অতি সৌভাগ্যজনক ঘটনা। হুকার সাহেবের জার্নাল ছাড়া জলপাইগুড়ির ওই সময়কে অনুভব করার মতো দ্বিতীয় উপাদান এখনও পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে বিচার করলে উমেশবাবু জরুরি একটি কাজ করেছেন।

পুরনো জলপাইগুড়ি বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের কাছে অনুবাদটি যে উপভোগ্য মনে হবে তা বলাই বাহুল্য। জলপাইগুড়ি তখন হরেক গাছপালায় ঘেরা একটি গ্রামমাত্র। হুকার লিখেছেন— ‘তবে বাড়িঘরগুলো নজরে পড়ার মতো। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ির ডোয়াগুলি দেখতে আহামরি না হলেও গেরুয়া মাটি দিয়ে সুন্দরভাবে নিকানো। বাড়ির চালাগুলি বেশ বড়সড়ো ও উঁচু, কোনওটা অবশ্য খুবই ছোট এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে সে চালাগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাওয়া হয়েছে।’

হুকার সাহেব যখন এসেছিলেন, তখন দোল উৎসব। সেই উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বেলুনে রং ভরে ছুড়ে মারার ব্যাপারটা তখনও ছিল। অবশ্য রাজদরবার সন্ধ্যাকালীন দোলপালনের পরিবেশ হুকারকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি পালিয়ে বেঁচেছিলেন। তবে দোলের দ্বিতীয় দিন রাজবাড়ির শোভাযাত্রা এবং দিঘিতে বিসর্জনের উৎসব তাঁর বেশ ভাল লেগেছিল।

জঙ্গলমহলে তিনি রংধামালি, বোদাগঞ্জ, রাম্মাম, ল্যানডং, চুমুকডাঙা হয়ে সেবক পর্যন্ত এসেছিলেন তিস্তার পশ্চিম পাড় ধরে। এই বিবরণ অতি মূল্যবান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন যেমন, তেমনই উল্লেখ করেছেন মহলের জনজাতি, গাছপালা, ভূপ্রকৃতি, নদীর বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অংশে উমেশ শর্মার হুকারের পথে জঙ্গলমহল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অবশ্য হতাশাজনক। রাজপরিবারের বংশধর প্রণত বসুর সঙ্গে সে পথে ভ্রমণ করে তিনি দেখেছেন যে, হুকারের দেখার সঙ্গে মিলছে না অনেক কিছুই। হারিয়ে গিয়েছে সেই সুগভীর অরণ্য, বদলে গিয়েছে তিস্তার গতি, জনপদের বিন্যাস, এমনকি ইতিহাসের চিহ্নগুলোও। বাংলাদেশ আর আসাম থেকে আসা মানুষের কারণে গড়ে উঠেছে একের পর এক নতুন বসতি, গ্রাম। হুকার লিখেছিলেন যে তিনি বৈকুণ্ঠপুরের প্রাচীন রাজধানীতে এসেছিলেন। মাত্র দেড়শো বছর পর সে রাজধানীর কোনও চিহ্নই খুঁজে পাননি অনুবাদক এবং তাঁর সঙ্গী। ইতিহাসের বিলুপ্তপ্রায় গুটিকয় চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই মেলেনি হুকারের বর্ণনার সঙ্গে।

জলপাইগুড়ি নামকরণের পিছনে ‘জলপাই’ গাছের অবদানের কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু হুকার সাহেবের বর্ণনায় জলপাইগুড়ি এবং জঙ্গলমহলের গাছপালার যে পরিচয় পাওয়া গেল, সেখানে কিন্তু জলপাই গাছের কোনও উল্লেখই নেই। সে সময়ের বড় গ্রাম জলপাইগুড়িতে অনেক জলপাই গাছ থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর নজরে পড়ত। অথচ বেথুয়া শাকের উল্লেখ থাকলেও জলপাই নেই।

আমার অনুমান, জলপাইগুড়ি নামকরণের পশ্চাতে জলপাই গাছের ভূমিকা আদৌ নেই। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান জরুরি।

বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের ইতিহাস এবং পুরনো জলপাইগুড়ি নিয়ে উমেশ শর্মা অনেকদিন ধরেই গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় একক উদ্যোগে প্রকাশ করেছেন একাধিক গ্রন্থ। তাঁর অনুসন্ধানের ফসল নিয়ে মতভেদ থাকলেও তাঁকে উপেক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই। হিমালয়ান জার্নালের অংশবিশেষের আলোচ্যমান অনুবাদটি নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় কাজ। বইটি সুপাঠ্য। তবে প্রকাশনা আরও সাজানো-গোছানো হতেই পারত। ছাপার ভুল তেমন নজরে পড়েনি। হুকার সাহেবের পক্ষকাল ভ্রমণের পথনির্দেশক একটি মানচিত্রও ছাপা হয়েছে। এটা আকারে বড় হওয়া দরকার, কারণ স্থাননামগুলি প্রায় পড়া যায় না। ছাপা ফোটোগুলিও আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

ইতিহাস বলে যে কোচবিহার এবং বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য দুই সহোদর ভাইয়ের হাতে গড়ে উঠেছিল। বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে এই দুই রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ থাকলেও এ বিষয়ে অনেক কাজ এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। উমেশবাবু ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও যে আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে একা একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তা যদি কাউকে উৎসাহিত করে, তবে আমরা উপকৃত হব। এর জন্য ইতিহাসে ডিগ্রি না থাকলেও চলবে।

স্যার ডি. কে. হুকারের পথ ধরে জলপাইগুড়ি ভ্রমণ। উমেশ শর্মা। লেখক দ্বারা প্রকাশিত। জলপাইগুড়ি। ৩০ টাকা।

শু.চ.

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশুনাট্য উৎসবে জলপাইগুড়ির ‘কলাকুশলী’

গত ২২ নভেম্বর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আয়োজিত দেশের সর্ববৃহৎ শিশুনাট্য উৎসব ‘জশন-এ-বচপন’-এ যোগদান করে ‘কলাকুশলী’ ফিরল দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, যা নিঃসন্দেহে এই বিয়াল্লিশ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী নাট্যসংস্থার অনুশীলনকে আরও এক ধাপ উৎসাহিত করল। বিভিন্ন দেশের মোট ২৫০টি সংস্থা দরখাস্ত করেছিল এই উৎসবে, যোগ্যতার বিচারে আহ্বান পেয়েছে ২৭টি দল। ভারতীয় দলগুলি ছাড়াও ছিল পাকিস্তান, ইজরায়েল, ফ্রান্স, তুরস্ক ও শ্রীলঙ্কা থেকে পাঁচটি বিদেশি নাট্যদল। উত্তরবঙ্গের প্রথম নাট্যদল হিসেবে এই মহোৎসবে জায়গা করে নিয়ে কলাকুশলী সত্যিই গৌরবান্বিত করল জলপাইগুড়িসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গকে।

‘ভোকাট্টা’ নাটকটি নিয়ে তাদের যাত্রায় সব মিলিয়ে ছিলেন পঁচিশজন। নাট্যরূপ ও পরিচালনা করেছেন তমোজিৎ রায়। কাহিনিটি পশ্চিমবঙ্গের কোনও এক অখ্যাত স্থানের লাট্টু নামক এক অনাথ ছেলেকে নিয়ে, যে তার কাকার নোংরা লোহালক্কড়ের দোকানের শিশুশ্রমিক। ওই অঞ্চলেই আকাশে দাপিয়ে বেড়ায় ‘কালি’ নামের এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ঘুড়ি। লাট্টু আবার তার বয়সি অন্য বাচ্চাদের মতোই ঘুড়িপাগল। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে লাট্টুর একটাই তফাত, অন্যরা যেখানে কালির কাছে হেরে গিয়ে হাল ছেড়ে দেয়, লাট্টু সেখানে বারবার হেরে গিয়েও হার মানে না। মনের দৃঢ়তা, সংকল্পের জোরে কীভাবে লাট্টু কালিকে হার মানতে বাধ্য করে, শিশুশ্রমিক থেকে হয়ে ওঠে ছাত্র লাট্টু, সেটাই নাটকটির প্রাণবীজ। কিন্তু নাটকটি শুধুমাত্র প্রচলিত শিশুশ্রমিক ব্যবস্থা, অশিক্ষার প্রতিবাদে এক কামান দাগার গল্প হয়েই থেমে থাকেনি, নাটকটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পরতে পরতে মিশে আছে এক স্বপ্ন ছোঁয়ার জেদের কথা, লক্ষ্যভেদ করার আত্মপ্রত্যয়ের কথা, যা এক নিছক ঘুড়ি কাটার গল্পকে ‘ভোকাট্টা’র মতো নাটকে উন্নীত করেছে। অদ্ভুতভাবে ভোকাট্টা হয়ে উঠেছে ‘কলাকুশলী’র রূপক, কলাকুশলীর স্বপ্ন ছোঁয়ার ধারাপাত। ২০০২ সাল থেকে দলটি চেষ্টা চালায় এনএসডি-র দরজায় কড়া নাড়তে, কিন্তু সব চেষ্টা সত্ত্বেও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি এতদিন। বারবার ফিরে আসতে

হয়েছে এনএসডি-র সিলেকশন রুম থেকেই। কিন্তু হার মানেনি কলাকুশলী। ১৪ অগাস্ট যখন দলের সভাপতি অভিজিৎ বসুর কাছে ফোন করে জানানো হয় যে তাঁরা মনোনীত, তখন চোখের জল আর বাঁধ মানেনি তাঁর। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার ‘অভিমঞ্চ’য় অনুষ্ঠিত এই নাটকটি নজর কেড়েছে সকলেরই। মুগ্ধ করেছে দিল্লির নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দকে। তার জন্য অবশ্য তমোজিৎ রায়ের পাশাপাশি কৃতিত্ব প্রাপ্য সমস্ত অভিনেতারও। নয়ন, দেবাশিস, অপূর্ব, শুভদীপ, সৌরভ, অনংশা, সৌরদীপা, পৌলোমী, অভিজিৎ, অমিত, শ্রুতি, মঞ্জিষ্ঠা, সৌকর্য, সায়নদীপ, অঙ্কুশ প্রত্যেকেই নাটকটিতে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। আবহ ও সংগীতে শৌভিক, আলো প্রক্ষেপণে সুজিত ও আশিস, মঞ্চ-পোশাক-রূপসজ্জায় অভিজিৎ, সহকারী নির্দেশনায় শুভদীপ এবং সর্বোপরি রচনা ও নির্দেশনায় তমোজিৎ। মফস্‌সল শহরে বেড়ে ওঠা একটি নাট্যদল আন্তর্জাতিক মাত্রায় বাংলা থেকে একমাত্র নাট্যদল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে দিল্লি পর্যন্ত তাদের নাটককে যেভাবে পৌঁছে দিল, এতে আর একবার প্রমাণ হল, জলশহরের তথা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

উন্মুক্ত আকাশে পৃথা

ডিসেম্বরের ১১, ২০১৬। রবিবারের এক হিমেল সন্ধ্যায় কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলের পরিবেশ ছিল যথেষ্ট উষ্ণ। ভরতি আসন নানা বয়সের দর্শকে। তার মধ্যে শহরের জ্ঞানীগুণী মানুষরাও ছিলেন। হাতে হাতে ঘুরছিল গরম কফি আর স্ন্যাক্স। আড়াই ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রোতা-দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। তার মধ্যে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট জুড়ে মূলপর্ব অর্থাৎ অঞ্জনা দে ভৌমিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উন্মুক্ত আকাশে পৃথা’ প্রকাশ অনুষ্ঠান। পরিচিতদের মধ্যে হাজির ছিলেন শহরের প্রবীণ কবি রণজিৎ দেব, ইতিহাসবিদ নৃপেন্দ্রচন্দ্র পাল, শিক্ষাবিদ ভূপালী রায়, চিকিৎসক সুভাষচন্দ্র সাহা প্রমুখ। রণজিৎ দেব বললেন, কবির সংখ্যা বাড়ুক, পাঁচজন পড়লেই কবিতা সার্থকতা পায়। নৃপেনবাবু বললেন, উদ্যোগ প্রশংসনীয়, কিন্তু কবিতার পাঠক কমে যাচ্ছে। ‘উন্মুক্ত আকাশে পৃথা’ বইটি ৫১টি কবিতার সংকলন। অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতি, সংগীত ইত্যাদির বাইরে উল্লেখ্যযোগ্য ছিল তরুণী মৌলি চক্রবর্তীর অনবদ্য পরিবেশনা এবং তাঁর প্রশিক্ষক বাচিক শিল্পী চায়না পাল চৌধুরীর ‘উন্মুক্ত আকাশে পৃথা’ বইটি থেকে দু’টি কবিতা পাঠ। কবির নারী হৃদয়ের ভাবনা অনুষ্ঠানের আন্তরিকতায় সবার মনকে ছুঁয়ে গেল।

নিজস্ব প্রতিনিধি

অরণ্য মিত্র

৬৪

কন্যাসাথীর আপিসে গেলেন কনক দত্ত। দেখা হল শুক্লা দাসের সঙ্গে। সেখানে কি কিছু খুঁজে পেলেন তিনি। ডার্ক ক্যালকাটা এবং দিল্লি হাই— দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পল অধিকারী কি ডাবল এজেন্ট হতে যাচ্ছেন? নদীর পাড়ে এক বৈঠকে তিনি কী বললেন কাদের? নিশ্চিন্তে নীল ছবির কাজে মেতে থাকা মনামীর সামনে কি বিপদ অপেক্ষা করে আছে? দুই শক্তিশালী গোষ্ঠির লড়াইতে এবার কি জড়িয়ে যাচ্ছে সেও? কাশিয়াগুড়ি নামক ছোট্ট গ্রামে শ্যামল নামক এক তরুণের নিখোঁজ হওয়ার সূত্রে শুরু হওয়া এই কাহিনির পাত্রপাত্রীরা যেন এক অদৃশ্য কিন্তু অপরিহার্য ইশারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ডুয়ার্সে। কেউ কি আছে নেপথ্যে?

কন্যাসাথির অফিসে একজনকেই পেলেন কনক দত্ত। মহিলা তাঁকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছিল। অভিজ্ঞ পুলিশি চোখে মহিলাকে একবার মেপে নিলেন কনক দত্ত। সবুজ শাড়ির উপর নীল রঙের উইন্ডচিটার। সুঠাম চেহারা। এই ধরনের সংস্থায় যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা জীবনে অনেক কঠিন জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। তাই নারী বলে উপেক্ষা-অবজ্ঞার কোনও প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া কনক দত্ত জানেন যে, তিনি নিজেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছেন, যা গোপন রাখতে হবে।

'এখানে কি এসটি মেয়েদের কোনও সুবিধা পাওয়া সম্ভব?' মহিলাটি এগিয়ে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন কনক দত্ত। 'আমি আসলে ইনফর্মেশন নিতে এসেছিলাম।'

'আসেন। আমার নাম শুক্লা দাস। দিদিরা সবাই ফিল্ডে গিয়েছেন। ইনফর্মেশন আমি কিছু কিছু দিতে পারব।'

কনক দত্ত সামান্য বিস্মিত হলেন শুক্লা দাসের আন্তরিকতায়। দিদিরা সবাই ফিল্ডে তো ইনি কে? অবশ্য শুক্লা দাস একজন কর্মী হতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবক হওয়াও সম্ভব। উত্তরটা শুক্লা দাস পরের কথাতেই দিলেন, 'আমি এখানেই কাজ করি। এখন তো ট্রেনিং নাই। দিদিরা ফিল্ডে গেলে সেন্টারে আমি একাই থাকি।'

'কাদের ট্রেনিং হয়?' এদিক-ওদিক তাকিয়ে জানতে চাইলেন কনক দত্ত।

'এসটি মেয়েদের ট্রেনিং হয়। এখান থেকে জলপাইগুড়িতে হস্টেলে থেকে ট্রেনিং-এর জন্য আমরা পাঠাই সার। ওই যেইসব এসটি মেয়ের কেউ নাই। বাগান এলাকা থেকে আসে। আসলে আমাদের কাজ ওইসব মেয়ের তথ্য জোগাড় করা। দিদিরা সেটা করেন। কোথাও এসটি মেয়ে খারাপ আছে খবর পেলে আমরা যাই। আমি যাই না সার, দিদিরা যায়। গাড়ি আছে। বড় গাড়ি। চা খাবেন?'

'চা?' কনক দত্ত চকিতে একবার ভেবে নিলেন। জায়গাটা নিয়ে খটকা যখন মনে একবার লেগেছে, তখন সেখানে কিছুক্ষণ থাকা যেতেই পারে। শুক্লা দাস বোধহয় কথা বলতে ভালবাসেন। দেখা যাক, কিছু এগয় কি না।

'আমার খোঁজে একটি এসটি মেয়ে আছে। তার জন্যই খোঁজ নিচ্ছিলাম।' বললেন কনক দত্ত।

শুক্লা দাস খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, 'বসেন না সার। ওই ঘরে বসেন। আমি চা বানাই।'

'এ বাড়িটা কি ভাড়া?' কনক দত্ত এক পা-দু'পা করে শুক্লা দাসের দেখিয়ে দেওয়া ঘরটার দিকে এগতে থাকেন।

'হ্যাঁ সার। এর মালিক ফালাকাটায় থাকেন। নবেন্দু মল্লিক। চিনলেন তো সার? যুব নেতা। মেলা পাওয়ার। তবে আমাদের কম ভাড়ায় দিসেন।'

'হুম।' কনক দত্ত একটু গম্ভীর হলেন। শুক্লা দাস ভাবল, সেটা নবেন্দু মল্লিকের নাম শুনে হল। কিন্তু কনক দত্ত ভাবছিলেন অন্য কথা। মহিলা তাঁকে চেনে। সে নাম জানতে চায়নি। কনক দত্ত

যে বাইরের কেউ নয়, সেটা সে ধরেই নিয়েছে। অর্থাৎ নাম এবং ধাম— দুটোই হয়ত শুক্লা দাসের জানা। সে ক্ষেত্রে মহিলার আচরণ কিঞ্চিৎ গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। অবসরগ্রহণের পর কনক দত্ত আর-একজন সিনিয়র সিটিজেন মাত্র। কিন্তু তাঁকে যেন একটু বেশিই গুরুত্ব দিচ্ছে শুক্লা দাস।

তাহলে কি প্রথমবার যখন এসেছিলেন এই অফিসে, তখন শুক্লা দাস তাঁকে চিনে রেখেছিল?

ঘরটা কন্যাসাথির অফিসঘর। একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে কনক দাস ঘরটা মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বাইরে থেকে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভিতরটা উলটে দেখার কোনও সুযোগ নেই তাঁর। ঘরের ভিতরের দরজাটা খোলা। ওপাশে উঠোন আছে একটা।

মিনিট পনেরো পর প্লেটে বিস্কুট আর এক কাপ চা নিয়ে শুক্লা দাস ঢুকলেন।

'আপনি কি আমাকে চেনেন?' কনক দত্ত বেশ শান্ত স্বরে উচ্চারণ করলেন প্রশ্নটা।

শুক্লা দাস স্পষ্টত অপ্রতিভ হয়ে গেল। বলল, 'আপনি একবার আসছিলেন না এখানে? আপনি আগে পুলিশ ছিলেন, তা-ই না?'

'আপনি ছিলেন সে দিন এখানে?'

'দিদিদের মুখে শুনছিলাম সার। জল খাবেন?' শুক্লা দাস আবার স্মার্ট হয়।

'আপনার সেই এসটি মেয়েটার বয়স কত?'

'সতেরো।' চায়ে চুমুক দিলেন কনক দত্ত। ভাল স্বাদ। বললেন, 'ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। কিছু যদি হয়, তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

'নাম, অ্যাড্রেস দিয়ে যাবেন সার। আমাদের টিম চলে যাবে।'

'আমি মেয়েটিকে এখানে যোগাযোগ করতে বলব'খন।' কনক দত্ত কথাটা বলার পর লক্ষ করলেন, শুক্লা দাসের মুখে খানিকটা স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল।

'মেয়েটা এলেই হবে সার।' তাড়াতাড়ি জানায় সে। তারপর বিস্তৃতভাবে বোঝাতে শুরু করে কন্যাসাথির উদ্দেশ্য, এবং তাদের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে থাকে। কনক দত্ত নীরবে চা খেতে খেতে মন দিয়ে শুনলেন সেসব। হঠাৎ তাঁর নজরে এল টেবিলের পায়া ঘেঁষে পড়ে থাকা আধপোড়া সিগারেট।

'এখানে কেউ সিগারেট খায় নাকি?' শুক্লা দাসকে থামিয়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ঘরের বাইরে দেখলাম নো স্মোকিং লেখা আছে!'

শুক্লা দাস সিগারেটের পড়ে থাকা অংশটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আমাদের গাড়ির ড্রাইভারটা সার। কেউ না থাকলে এখানে সিগারেট খায়! আমি দিদিকে রিপোর্ট করব।'

পিকনিকের আয়োজন বিশেষ মিটিং-এর জন্য। মাঝে মাঝে মদ্যপানের ইচ্ছে হলে গতিন রায় এইখানে দু'-তিনজন ইয়ারদোস্ত নিয়ে এসে বসেন সন্ধের পর। কাঠের আগুনে মাংস রান্না করেও খাওয়া হয়। আজকেও যেন তা-ই হচ্ছে। গতিন রায় মাংস ভালই রাঁধেন।

'করাই উচিত।' কনক দত্ত উঠে দাঁড়ালেন, 'খারাপ কাজ। ঠিক আছে। আমি মেয়েটাকে এখানে দেখা করতে বলছি। ওর কিন্তু গার্জিয়ান বলতে সেভাবে কেউ নেই।'

'এই ধরনের মেয়েদের এটাই সমস্যা সার। আপনি কি এখন চলে যাচ্ছেন?'

'কাশিয়াগুড়িতে এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাব। উনি আমার বাড়িতে রান্নার কাজ করেন। চিনতে পারেন। ওঁর ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কে সার? শ্যামল? ও তো নেপালি মেয়েকে বিয়ে করে পালিয়েছে!'

কনক দত্ত কোনও কথা না বলে শুক্লা দাসের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় একটু হাসলেন মাত্র।

৬৫

আয়োজন বেশি নয়। মসুর ডাল, আলু সেদ্ধ আর মুরগির মাংস। চায়ের ছোট বাগানটা ঢালু হয়ে একটা জমিতে হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে। জমির ঢাল নেমে গিয়েছে অদূরে প্রবহমান ছোট নদীর কূলে। নদী আর বাগানের মধ্যবর্তী অংশে ঘাসজমির উপর মাদুর বিছিয়ে রান্নার আয়োজন। সামনে একটু দূরে যাঁর বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছিল, চায়ের বাগানটাও তাঁর। তাঁর নাম গতিন রায়। বিশিষ্ট অতিথির সম্মানার্থে তিনি এই পিকনিকের ব্যবস্থা করেছেন আজ রাতে।

ছোট নদীটা গিয়ে মিশেছে জলঢাকায়। আসলে এর নাম ছিল জলধক্কা। নদীর বেশ উজানে থাকা এই গ্রামটায় অনেক চাষিই ধান-পাট ছেড়ে চা চাষের দিকে ঝুঁকেছে। গতিন রায় মাঝারি মাপের চাষি। সংসার কমবেশি চলে যায়। কামতাপুর রাজ্যের প্রবল সমর্থক গতিন রায় কেএলও-র প্রতি সহানুভূতিশীল। উক্ত দলের অনেক সদস্য এবং সমর্থকের সঙ্গে তাঁর কমবেশি যোগাযোগ থাকে।

পল অধিকারী তার মধ্যে একজন।

কিন্তু গতিন রায়ের কাছে পল অধিকারী একা আসেননি আজ দুপুরে। সঙ্গে একজন দেহরক্ষীও এসেছে। দুপুর নাগাদ বেশ হাওয়া বইছিল। বিড়ি ধরাতে অসুবিধা হচ্ছিল গতিন রায়ের। বাগানে দেখভালের কাজ করছিলেন তিনি। ক'দিন পাতা তোলা বন্ধ আছে। বাগানে একাই ছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখেছিলেন দু'জন এগিয়ে আসছে। পল অধিকারীকে চিনতে কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল গতিন রায়ের। তারপর মুহূর্তের জন্য আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। মিনিট দশেক পর দেখা গেল, তিনজনই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছেন বাগান থেকে।

পিকনিকের আয়োজন বিশেষ মিটিং-এর জন্য। মাঝে মাঝে মদ্যপানের ইচ্ছে হলে গতিন রায় এইখানে দু'-তিনজন ইয়ারদোস্ত নিয়ে এসে বসেন সন্ধের পর। কাঠের আগুনে মাংস রান্না করেও খাওয়া হয়। আজকেও যেন তা-ই হচ্ছে। গতিন রায় মাংস ভালই রাঁধেন। আধ বোতল সিক্সটি পেটে যাওয়ার পর তিনি আজকেও রান্না শুরুর উদ্যোগ নিতেই অধিকারী জানিয়েছিলেন যে, রান্না করবে তাঁর দেহরক্ষী।

তারপর আলোচনা শুরু হয়েছে। পল অধিকারী খুব তাড়াতাড়িই অ্যাকশনে নামার কথা ভাবছেন। কিন্তু অদ্ভুত কারণে ডুয়ার্সের দুটো গ্রুপ তাঁকে টাকা জোগাচ্ছে। গ্রুপ দুটো পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পল অধিকারী দুই দলের কাছ থেকেই টাকা নিচ্ছেন। একটা দল চাইছে ডুয়ার্সে কয়েকটা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে, এবং সেই দলের কয়েকটা ঘাঁটিতে হামলার বরাত দিচ্ছে অপর দল। পল অধিকারীর বিবেচনায়, বিষয়টা বেশ অদ্ভুত।

পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, ডুয়ার্সে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে তা প্রথম দলের কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে, সেটা না জেনে থাকলেও বিস্ফোণের ঘটনায় পল অধিকারীর লাভ নিশ্চিত। তিনি নিজেও চাইছিলেন সংগঠনের পক্ষ থেকে আতঙ্ক ছড়াতে। এখন তাঁর সামনে এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ। কিন্তু কাজটায় ঝুঁকির দিকটা নিয়ে ভাবছেন তিনি। এটা সরকারের সন্ত্রাসদমন পরিকল্পনার কোনও গুপ্ত প্ল্যানও হতে পারে। তেমন কোনও দরাদরি ছাড়াই যেভাবে তাঁর লোকের কাছে দুই দলের লোক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা সন্দেহের বাইরে রাখা অনুচিত। দাসবাবু যে সূত্রে তাঁর সন্ধান পেয়েছেন তা খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হলেও সুরেশ কুমার নামের লোকটা বেশ রহস্যময়।

বস্তুত, বুদ্ধ ব্যানার্জির বাইরে আর কেউ

তাঁর বেঁচে থাকার খবরটা জানত বলে পল অধিকারী বিশ্বাস করতে চাইছেন না। গম্মেন্টে অবশ্য বুদ্ধ ব্যানার্জির প্রতিপক্ষের অভাব নেই। তারা কোনওভাবে খবর পেলে পুরো ডুয়ার্সের পুলিশ সজাগ হয়ে যেত। পল অধিকারী সেটা টের পেতেন। সমতলে এত নিশ্চিত নেমে আসাটা সহজ হত না তাঁর পক্ষে। হয়ত নামতেনও না। এই ডুয়ার্সে যারা মেয়ে পাচার, পর্ন এবং লাল চন্দন পাচারের ব্যবসা করে, তাদের কানে পুলিশি তৎপরতার খবর বাতাসের আগে পৌঁছায়। সব চাইতে বড় কথা যে, বুদ্ধ ব্যানার্জি ঠিক জানতে পেরে যান।

শুনতে শুনতে গতিন রায়ের নেশাই ছুটে গেল। মাংসের গন্ধটা দিব্যি বার হচ্ছে। কম্বলটা ভাল করে গায়ে পেঁচিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। চারদিকেই মিশকালো অন্ধকার। এখানে শুধু কাঠের আগুন সামান্য আলো আর উষ্ণতা দিচ্ছে। তাঁর সামনে বসে আছে এমন একজন চরিত্র, যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য একসময় রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন উঠেপড়ে লেগেছিল। তারপর বিশ্বাস করে নিয়েছে যে সে মৃত।

'ভাল্ করি বিবেচনা করার নাগে পল!' গতিন রায় বলেন, 'মোর ডিউটিখান ক। কায় কায় নাগাবি বোম?'

'মোক কিসু ইনফর্মেশন আনি দে।' বললেন পল অধিকারী। তারপর জানালেন যে, তাঁর লোক সুরেশ কুমারকে ফলো করে দেখেছে যে গতিনদের গ্রামে তার একটা অনুচর আছে। সে অনুচর লাল চন্দন পাচারের সঙ্গে অল্প অল্প যুক্ত ছিল এককালে। এখন টুকটাক করে খায়। মাস দুয়েক হল সে একটা বাইক কিনেছে। যদিও সেকেন্ড হ্যান্ড, কিন্তু সে কিনতেও টাকা লেগেছে তার।

এইটুকু শুনে গতিন রায় চিনে ফেললেন নিজের গ্রামের সেই ব্যক্তিকে। একটু উত্তেজিতভাবে তাই বললেন, 'মিন্টুর কথা কসিস তুই? কিঙ্গে তো বাইক। বিশ হাজার দিয়া কিঙ্গে উয়ায়। মুই জানঅ।'

'উয়ারে স্পট নাগা।' বলে মাংসের স্বাদ পরখ করতে উঠলেন পল অধিকারী।

৬৬

কয়েকদিন হল সকালে হাঁটতে বার হচ্ছে মনামি। সকাল সাড়ে ছ'টায় শেষ শীতের শিলিগুড়িকে ভারী অন্যরকম লাগে। ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা। হইচই, শব্দ খুব কম। ফ্ল্যাটের গলি থেকে বড় রাস্তায় না উঠে আরেকটা গলিপথ ধরে আধ ঘণ্টার মতো হাঁটলে বাঘাযতীন পার্কে এসে ওঠা যায়। মনামি এই গলিপথটাই বেছে নিয়েছে, কারণ জগিং করতে সুবিধা হয়। হালকা গোলাপি ট্রাক সুট আর সাদা ফুলহাতা টপ পরে মনামি আজ ফ্ল্যাটের বাইরে এসে বুঝল, শীতটা অনেক কমে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ঠান্ডা লাগলেও কিছুটা জগিং করার পর অতিরিক্ত শীতবস্ত্রের দরকার হবে না। তাই সিকিয়োরিটি গার্ডের কাছে জ্যাকেটটা জমা দিয়ে মনামি রাস্তায় এল। জগিং শুরু করার আগে একটু হাঁটা দরকার। পার্কের দিকে যাওয়ার গলিপথটায় পা দিয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলতে শুরু করল। পঁচিশ-তিরিশ পা হাঁটার পর সে যখন জগিং-এর জন্য তৈরি হচ্ছে, তখনই শুনল কেউ ডাকছে, 'মনামি ম্যাডাম!'

গলাটা অচেনা এবং কোনও পুরুষের। মনামি ঘাড় ঘোরাতেই দেখল একটি মাঝারি উচ্চতার ছেলে তাকে ডেকেছে।

'মনামি ম্যাডাম তো?' ছেলেটা হাসিমুখে এগিয়ে এল। মনামি তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল, 'আপনাকে কিন্তু চিনলাম না।'

'ম্যাডাম, নবীন রাই ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।' ছেলেটা মনামির ফুট চারেক আগে দাঁড়িয়ে গিয়ে জানাল। মনামি এবার বিস্মিত হল রীতিমতো। নবীন রাই?

'এই গাড়িতে।' ছেলেটা হাত তুলে মনামির ফেলে আসা রাস্তাটা দেখিয়ে বলে। সত্যিই একটা নীল রঙের ইউএসভি দেখা যাচ্ছে এবার ছেলেটার পিছনে। গলির বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সেটা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা একদম কাছে চলে এল। ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে নবীন রাই নয়। পিছনের সিটে কেউ আছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না সে কে। নবীন রাই?

একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে গাড়িটার পাশে এল মনামি। তখনই পিছনের দরজাটা খুলে গেল এবং মনামি টের পেল তার ঘাড়ের উপর একটা শীতল স্পর্শ। পরক্ষণেই গাড়ির ভিতর থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত বেরিয়ে এসে চেপে ধরল মনামির হাতটা। এক ঝটকায় কেউ তাকে টেনে নিয়ে এল গাড়ির পিছনের সিটে। সে চিৎকার করতে গিয়ে ব্যর্থ হল। কারণ গাড়ির বাইরে থাকা ছেলেটা ততক্ষণে ভিতরে চলে এসেছে, এবং মনামি দেখতে পাচ্ছে, একটা পিস্তলের নল তার বুকের থেকে মাত্র দু'ইঞ্চি দূরে। নলটা বেশ লম্বা।

'এতে সাইলেন্সার আছে খুকুমণি!' গাড়ির ভিতরে থাকা লোকটার গলা শুনল সে, 'নিঃশব্দে তোমাকে লাশ বানিয়ে রাস্তায় ফেলে চলে যাবে। কোঅপারেট করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রিলিজ পাবে।'

মনামি শান্ত থাকল। গাড়ি চলতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে। মনামি এবার দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাকাল একবার। সে নবীন রাই নয়। বাঙালি কি না বোঝা মুশকিল। চেহারাটা অতি বলিষ্ঠ। সে দু'জন অচেনা অপহরণকারীর মাঝখানে বসে থাকল পাথরের মতো। প্রায় আধ ঘণ্টা শিলিগুড়ির এ রাস্তা-সে রাস্তা দিয়ে চলার পর মনামি দেখল, গাড়িটা চম্পাসারি পেরিয়ে একটা সরু গলিতে ঢুকছে। গলির একদিকে পরপর নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটবাড়ি। আরেক দিক প্রাচীরে ঢাকা। সেটা সম্ভবত একটা কারখানাজাতীয় কিছু। গাড়িটা থামল একটা অর্ধসমাপ্ত বাড়ির সামনে। ওদের নির্দেশে বিনা প্রতিবাদে গাড়ি থেকে নামল মনামি। ওরা তাকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে এল। এই ফ্ল্যাটটা প্রায় শেষের দিকে। একটা ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেল, সেখানে মেঝেতে চমৎকার গদি পাতা আছে।

বলিষ্ঠ লোকটা এক ধাক্কায় মনামিকে গদির উপর ফেলে দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তারপর হিসহিস করে বলল, 'দুটো অপশন দিচ্ছি খুকুমণি! হয় সুরেশ কুমারের খোঁজ দেবে অথবা তোমাকে আমি রেপ করব। রেপের ভিডিয়ো মোবাইলে তোলা হবে। সেটা বাজারে ছেড়ে দেব। একটা কপি হোয়াটসঅ্যাপ করে দেব তোমার ডাক্তার বাবার মোবাইলে। এখানে চেঁচিয়ে লাভ নেই। শোনা যাবে না।'

মনামি জবাবে সামান্য হাসল। তারপর দু'জনকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরে ফুলহাতা টপটা খুলে ফেলল শরীর থেকে। তার অলৌকিক নগ্ন পিঠে লেপটে লাল ব্রেসিয়ারের ফিতের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে থাকল দু'জন।

'ডু ইউ রিয়েলি লাইক মি?' ঘাড় ঘুরিয়ে আশ্চর্য হাসল মনামি, 'সুরেশ কুমারকে আমি ফোন করে ডেকে আনতে পারি। বাট আই কান্ট রেজিস্ট মাইসেল্ফ ওয়াচিং ইয়োর ফিজিক ডার্লিং!'

কথাটা বলিষ্ঠ লোকটার উদ্দেশে। সে এবার ঘোর কাটিয়ে এগিয়ে আসছে। এবার তার হাত এসে পড়ল মনামির কাঁধে। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল এর পর। তখনই তার দিকে ফিরল মনামি। ব্রেসিয়ারের ফাঁকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখা চার ইঞ্চি লম্বা বোতলে যেটা ভরা ছিল, সেটা এখন তার হাতে। এক হাতে গলা জড়িয়ে আরেক হাতে সে বোতলটা লোকটার মুখের সামনে ধরল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা। দ্বিতীয়জন পলকের জন্য হতভম্ব হয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'চোখে অনুভব করল অসহনীয় জ্বালা।

পড়ে থাকা টপটা কুড়িয়ে ঝড়ের বেগে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল মনামি। বোতলের মাথায় চাপ দিলেই একটা তরল বেরিয়ে আসে। ওদের চোখের জ্বালা কমতে কম করে পনেরো-কুড়ি মিনিট। মেয়েদের নিরাপত্তারক্ষার এই চমৎকার অস্ত্রটা মনামিকে বুকের মধ্যে নিয়ে বাইরে বার হওয়ার উপদেশটা দিয়েছিল সুষমা।

(ক্রমশ)

রঞ্জিত রায়ের তৈরি কিছু বাঁশের শিল্প

বংশ শিল্পকথা

উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত অধিকাংশ গ্রাম বাঁশবাগানে সুসজ্জিত। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে রাজবংশী বাড়িগুলির একটি বৈশিষ্ট্যই হল বাঁশবাগান। রাজবংশীরা ইন্দো-মঙ্গোলীয় বা কিরাত জনজাতির একটি শাখা। মঙ্গোলীয়রা সবচেয়ে বেশি বাঁশ ব্যবহার করত। তাই রাজবংশী সমাজেও বাঁশের অবদান খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত যে, কালবৈশাখী ঝড়ের হাত থেকে ঘরবাড়ি রক্ষা করার জন্য তারা পশ্চিমে বাঁশ গাছ লাগাত। এটা তাদের একটি রীতি ছিল। অন্য দিকে, দৈনন্দিন জীবনে নানা ক্ষেত্রে বাঁশের দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণের উদ্দেশ্যেও তারা বাঁশ গাছ ব্যবহার করে থাকে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে ও গ্রামীণ অবস্থান অনুযায়ী এই ঐতিহ্যবাহী বাঁশজাত শিল্পধারা আজও উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির মোড়কে ঠিক আছে। জেলায় বসবাসরত নানান জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ এই শিল্পে অধিক পরিমাণে যুক্ত। তাদের গৃহনির্মাণ বা বাস্তুশিল্পে বাঁশের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়াও অনেকে নানা শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে বাঁশের মাধ্যমে। রাজবংশী সমাজে বাঁশজাত শিল্পের নানা ব্যাবহারিক দিক হল— বাস্তু তৈরিতে বাঁশ, বাঁশের তৈরি বাদ্যযন্ত্র, কৃষিকাজে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী, দেবতার প্রতীক রূপে বাঁশ দিয়ে তৈরি মাছ ধরার যন্ত্রপাতি।

তথ্যের সন্ধানে হাজির হলাম ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মউয়ামারি গ্রামের রঞ্জিত রায়ের আস্তানায়। শিল্পীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে হস্তশিল্পের জন্য ব্যবহৃত বাঁশগুলি হল— মাকলা, পিলিং, পিল্লাই, রেডিও

মাকলা প্রভৃতি। খাট তৈরির জন্য তারা এক ধরনের বাঁশ ব্যবহার করে থাকে, যার নাম কোকোয়া। দুর্লভ এই বাঁশের প্রজাতিটি জলপাইগুড়ি জেলার রামশাই, বীরপাড়া, মাল, বাতাবাড়ি, মেটেলি অঞ্চলে পাওয়া যায়। যে কোনও প্রকার আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট তৈরি করার ক্ষেত্রে বাঁশ গাছটিকে কাটার পর অন্তত তিন মাস সেটিকে জলে ফেলে রাখতে হয়। তিন মাস পার হলে সেটিকে রোদে শুকানো হয়। শুকিয়ে যাওয়ার পর বাঁশটির একটি নির্দিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়, যা থেকে শিল্পীরা অনুমান করতে পারেন যে, সেটিকে এখন যে কোনও শিল্পের রূপ দেওয়া যায়।

জানা যায়, একসময় এই অঞ্চলে বাঁশের বিপুল সমাহার ছিল। ঘন জঙ্গলের পাশাপাশি ছিল বাঁশঝাড়। অনেকের তো বিঘার পর বিঘা বাঁশবাগান ছিল। বাঁশ দিয়েই বাড়িঘর, বেড়া, বসা-শোয়ার ব্যবস্থা করা হত। বাঁশের পাত্রেই ঘর-গেরস্থালির জিনিসপত্র রাখা হত। কোকোয়া বাঁশের একটি গিঁট রেখে নুন, জল, দুধের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হত। বর্মী ধানের চাল ভিজিয়ে বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে খাওয়া হত। রাজবংশীরা একে বলে 'ডিং'। এমনকি মাংস রান্নাও করা হত এই বাঁশের পাত্রে। সেসব লোকাচার আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। তবে মাছ ধরার যন্ত্রাদি, ঘরবাড়ির কাজে বাঁশের সূক্ষ্ম কারুকার্যময় কার্যাদি থেকে এক বিশেষ শিল্পী, কুশলী মনের পরিচয় পাওয়া যায় আজও। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের বাঁশ শিল্প বৃত্তিগত সূচনায় এক অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা তাদের স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অব্যাহত রেখেছে।

সুচেতনা পাল

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস এক বহুমুখী প্রতিভা

বাবা-মায়ের আদরের আতিশয্যে বেড়ে ওঠা মণিদীপার ছোটবেলাটা কেটেছে যৌথ পরিবারে। যৌথ পরিবারের ভাল দিকের প্রভাব মেয়ের উপর পড়তে যেমন প্রশ্রয় দিয়েছেন বাবা-মা, তেমনি আবার খারাপ থেকে আড়াল করে রেখেছেন নিজেদের বৌদ্ধিক চেতনা দিয়ে। ছোট্ট মণিদীপার শৈশব কেটেছে নাটকের পরিবেশে। বাবা ছিলেন অত্যন্ত গুণী মানুষ। নাটক তাঁর রক্তবিন্দুর সঙ্গে বইত সারা শরীর বেয়ে। সে সময় নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন গ্রুপ, কোচবিহার অত্যন্ত নামকরা একটি নাটকের দল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। নীরজ বিশ্বাস ছিলেন সেই দলের নাট্যকার এবং পরিচালক। তাঁর কন্যা হওয়ার সুবাদে বাড়িতেও একটি নাটকের আবহাওয়া। যখন রিহার্সাল চলত, ছোট্ট মণিদীপা বসে বসে দেখত সেই মুহূর্তগুলো। সেই খুদে বয়সেই 'চার দেওয়ালের গল্প' নাটকে শিশু চরিত্রে অভিনয় করে পুরস্কারও পায় সে। নাটক তাই মণিদীপার প্রথম ভালবাসা। ১৯৮২-তে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়বার সময় 'দিশারী পুরস্কার' হাতে উঠে আসে। 'ইন্দ্রায়ুধ' গোষ্ঠীর সঙ্গে নাটক করে মণিদীপা পান 'ঋত্বিক ঘটক পুরস্কার'। এ ছাড়াও কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন অভিনয়ের জন্য পেয়েছেন নানান পুরস্কার।

নাটকের পাশাপাশি গানের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দিতেন মা। কিছুটা হলেও বাড়ির অমতেই জোর করে গানের দিকে ঠেলে দিতে উৎসাহ জোগাতেন। সেই গান শেখা শুরু। পরবর্তীতে এমন একটা সময় এসেছে, যখন মায়ের মৃত্যু এবং গান এমনভাবে

পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে সামনে যে, চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে। ঘটনাটা এইরকম— ২০০৬-এ রবীন্দ্রসংগীতে এম.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য কলকাতায় রওনা হয়েছেন ট্রেনে। তখন তিনি জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত। পথে শুনলেন মায়ের মৃত্যুসংবাদ। মুহূর্তের মধ্যে ওলটপালট হয়ে গেল সমস্ত চিন্তাভাবনা। ছায়ার মতো পাশে থেকেছেন যে মা, তাঁর চেহারা ফুটে উঠছে চোখের সামনে। অন্য দিকে, মায়ের ইচ্ছেপূরণের জন্যে যে গান তা আজ তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে এতটা পথ। শুধু আজ পরীক্ষাটা দিতে পারলেই মাকে দেওয়া হবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও উপহার। এদিকে বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে মায়ের অন্তিম শয্যার পাশে। সঠিক পথনির্দেশকের মতো পাশে এসে দাঁড়ালেন অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়। বোঝালেন, মায়ের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধের প্রকৃত রূপায়ণ করতে হলে আজ পরীক্ষা দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। সেই গানের ফলেই আজ সৃষ্টি হয়েছে 'রবীন্দ্রবীথি', যেখানে একের পর এক পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান অনুবাদ হয়েছে সাদ্রি, মেচ ও রাজবংশী ভাষায়। অনুবাদ হয়েছে 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা'ও। গানের পাশাপাশি লেখিকা হিসেবেও নিজস্ব একটা জায়গা তৈরি করেছেন মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। ছোট পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে বড় বড় নামী পত্রিকাতেও অবিরাম গতিতে লিখে চলেছেন। 'দেশ'-এর শারদীয়া সংখ্যায় কবিতা লিখে চলেছেন অনেকগুলো বছর ধরে। লেখালেখির সুবাদে কলকাতাতেও অনেক গুণীজনের সান্নিধ্য পেয়েছেন, যা দুর্লভ। পত্রপত্রিকার পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছে একটির পর একটি বই। বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতো বই 'তিস্তা মেঘনা কইন্যা', যা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কৃত্তিবাস প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত, যাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ ঘুরে এসে সেখানকার নানান অভিজ্ঞতার কথা। পত্রলেখা, সিগনেট প্রেস, পাঠক, পরম্পরা ইত্যাদি নানান প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, গল্পসংকলন, এমনকি প্রবন্ধও। সেগুলোর মধ্যে 'ধূপ ছায়া বিকেল', 'অথৈ সবুজ জল কথা', 'শঙ্খচিলের ডানা', 'সন্ধ্যামণির ঘর', 'হাত রাখো কৃষ্ণসখা', 'বুকের দরজার কাছে', 'ভাঙা ছবির ইজেল' উল্লেখযোগ্য। 'দেশ' প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'চারটি উপন্যাস সংকলন'। তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে ইংরেজিতেও। নানান পুরস্কার ও সম্মাননায় আবেগে ভেসেছেন মণিদীপা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে যেমন পেয়েছেন স্মারক সম্মান, তেমনি রয়েছে বলাকা স্মৃতি সম্মান, চারুকৃতি সম্মান, বিনোদবিহারী ও ক্ষীরোদমঞ্জরী স্মৃতি পুরস্কার, নর্থ বেঙ্গল ভিশন স্মারক সম্মান, স্বরসৃজন সম্মান, বর্ণালী পুরস্কার ইত্যাদি। পুরস্কার পেয়েছেন পড়াশোনাতেও। মেধাবী এবং মনোযোগী

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে যেমন পেয়েছেন স্মারক সম্মান, তেমনি রয়েছে বলাকা স্মৃতি সম্মান, চারুকৃতি সম্মান, বিনোদবিহারী ও ক্ষীরোদমঞ্জরী স্মৃতি পুরস্কার, নর্থ বেঙ্গল ভিশন স্মারক সম্মান, স্বরসৃজন সম্মান, বর্ণালী পুরস্কার ইত্যাদি। পুরস্কার পেয়েছেন পড়াশোনাতেও।

ছাত্রী ছিলেন মণিদীপা। ১৯৮৬-তে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলা বিভাগে প্রথম হয়ে তৎকালীন রাজ্যপাল নুরুল হাসানের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার স্মৃতি আজও চোখ ভিজিয়ে দেয় তাঁর।

কোচবিহারের মেয়ে চাকরি ও বৈবাহিক সূত্রে জলপাইগুড়ির খুব কাছের মানুষ। বর্তমানে আবার তিনি ফিরেছেন তাঁর জন্মস্থান কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমি স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হয়ে। প্রথম জীবনে জলপাইগুড়িতে এসে স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পেরেছেন যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে, তাদের সঙ্গে নিয়ে সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ পেয়েছেন যেভাবে, এবং সর্বোপরি জলপাইগুড়ির মানুষের সাহচর্যের কথা অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করলেন মণিদীপা। মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস এক বহুমুখী প্রতিমার নাম। নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমস্ত দিক সামলে রেখেছেন যত্ন নিয়ে। স্বামী, কন্যা, পুত্রও তাঁর সেই স্পর্শে উষ্ণ।

শ্বেতা সরখেল

আমার আবার মেয়ে জন্ম হোক

ছোটবেলার দামাল দিনগুলোতে মেয়ে বন্ধুর সংখ্যাটা ছিল কম। পুতুল খেলার বদলে ক্রিকেট বা পিট্টু... দুরন্তপনায় সবার আগে। দল বেঁধে কতজনের যে কত অনিষ্ট করেছি! প্রাইমারি পেরিয়ে হাই স্কুল যেতেই টের পেলাম, ছেলেবেলা না, আমার মেয়েবেলা চলছে। পাড়ার বন্ধুরা আর খেলায় ডাকে না। একটু কি এড়িয়েই চলে? মা ডেকে বলেন, বিকেলে মাঠে যাস না, বাড়িতেই খেল। নিদেনপক্ষে পাশের বাড়িতে। আস্তে আস্তে আমার দৌরাত্ম্যের মাঠটাকে চোখের সামনে বদলে যেতে দেখি। সবুজ পেলব ঘাসের আস্তরণে কত দৌড়াতে চাইতাম মনে মনে। আর পারিনি কোনও দিন সেই মাঠে ফিরতে। সেই বন্ধুদের কাছে ফিরতে। আর-একটু যখন বড় হলাম, মা বললেন, কারও কোল ঘেঁষে বসবি না, আদর করতে দিবি না। জীবনের আরেক শিক্ষা পেলাম। এভাবেই কত কিছু শিখছি আজও। মা-র শাসন আর বাবার আদরে নিজেই এত বড় হয়ে গেলাম যে পুরনো সবকিছু দূরে চলে যেতে থাকল, ছোট হতে লাগল। যে মেয়েটা রোজ ছোট্ট থেকে ছোট্ট কথা মাকে না বলে শান্তি পেত না, সে আজ সবকিছুই লুকিয়ে রাখে। লুকিয়ে রাখে ভিড় বাসে অযথা ছুঁয়ে যাওয়া নোংরা হাতগুলোর গল্প অথবা অচেনা মুখের খারাপ ইঙ্গিত। এসব কথা কাউকে বলা হয় না। মাঝেমধ্যে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, কী চাও তোমরা? কিন্তু সেই প্রতিবাদী গলা হয়ে উঠতে পারি কই? ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠা হয় না আর। দলের একজন হয়েই বেঁচে থাকি। এই তো আমার মেয়ে জন্ম। তবু বলব, আমার এই জন্ম সার্থক।

বাবা-মাকে কোনও দিন আমার জন্য ছোট হতে দেখিনি। কতটুকু করে উঠতে পেরেছি তা জানি না, তবুও যখন দেখি মা পরিচিত কাউকে বলছেন, আমার মেয়ে স্কুলে পড়ায়, কোথায় যেন একটা চাপা গর্ব ঝরে পড়ে। চাকরিজীবী মেয়ের জন্য এ গর্ব নয়, এ হল মেয়েকে মানুষের মতো গড়ে তোলার অহংকার। বাড়িতে কেউ এলে আমার সদ্যপ্রকাশিত লেখাটা তোশকের নীচ থেকে বার করে আনে বাবা। কী থাকে সেই চোখে? এগুলোই আমার মেয়েজীবনের প্রাপ্তি। তবে শুধুই কি পেয়েছি? হারিয়েছিও তো কত কী! সেই মেয়েবেলার বন্ধুরা আজ অচেনা। হারিয়ে গিয়েছে খেলার মাঠটাও। ওখানে এখন একটা বড় কাঠের মিল। যেতে-আসতে চোখে পড়ে। চোখের কোলটা কি অজান্তেই ভিজে ওঠে না? কিছু প্রিয় মানুষ হারিয়ে গিয়েছে চিরতরে। তাদের আর খুঁজে পাব

কোনও দিন? তবু বলব, আমার এ মেয়ে জন্ম সার্থক। নিজের জন্মস্থান ছেড়ে যখন অন্য বাড়িকে নিজের করে সাজাতে এলাম, ভয় ছিল, কিছুটা দ্বিধাও। পারব তো আদৌ এতগুলো অচেনা মানুষকে আপন করে নিতে? পারব তো জীবনযুদ্ধে জিততে? জিতেছি কি না জানি না আজও। শুধু জানি, শ্বশুরবাড়ি হয়ে উঠেছে আমার বাড়ি। এখন তাদের দুঃখে কাঁদি, তাদের আনন্দে হেসে উঠি। আর অবাক হই, যখন দেখি তারাও আমারই মতো আমার অনুভূতিকে সম্মান দিচ্ছে। এগুলো কি প্রাপ্তি নয়? আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধবী, সহকর্মী, আরও নানা ক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠজনরা ঘিরে আছে আমায়, মনে রাখছে, ভালবাসছে— এগুলোই আমার মেয়েজীবনের প্রাপ্তি। ক'দিন খোঁজ না পেয়ে এই যান্ত্রিক যুগেও কেউ কেউ জানতে চায়, 'কী রে, কিছু কি হয়েছে? চুপচাপ কেন?' জীবনের যুদ্ধে জেতা হয়ে যায়।

তাই তো এ জন্মে লজ্জা নেই কোনও। বরং আবার আমার মেয়ে জন্ম হোক।

শাঁওলি দে

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-9/1 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর স্টলে থাকছে যে সব বই

জলপাইগুড়ি (১৯ ডিসেম্বর থেকে), কোচবিহার (৩ জানুয়ারি থেকে)

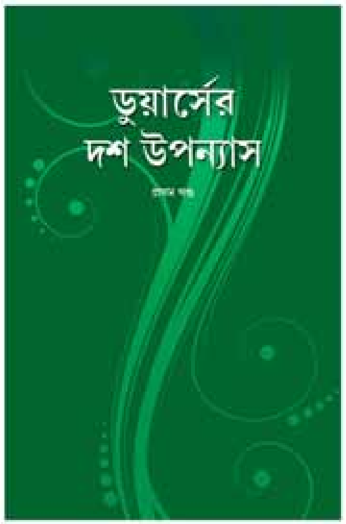

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

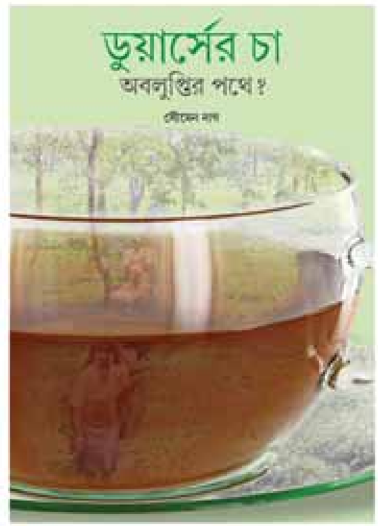

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

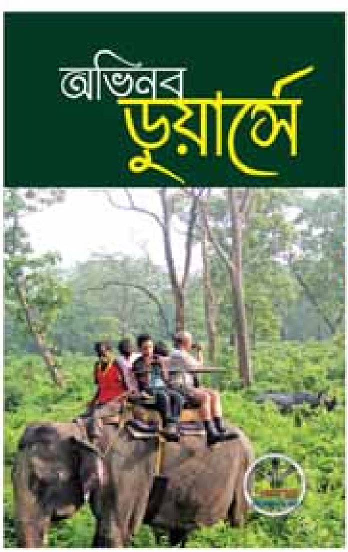

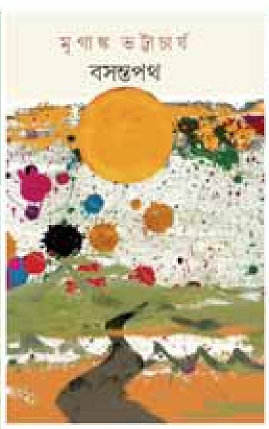

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

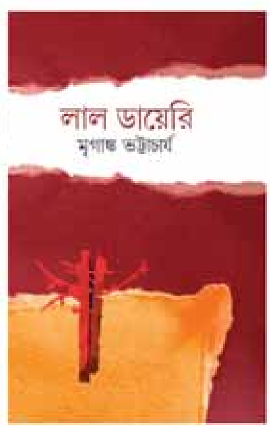

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

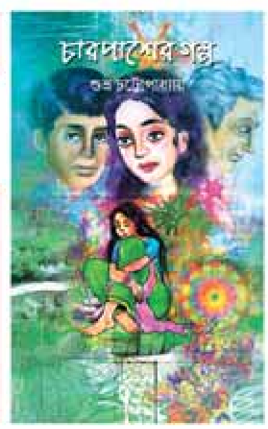

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.